শ্বেতহস্তী

জাফর চৌধুরী

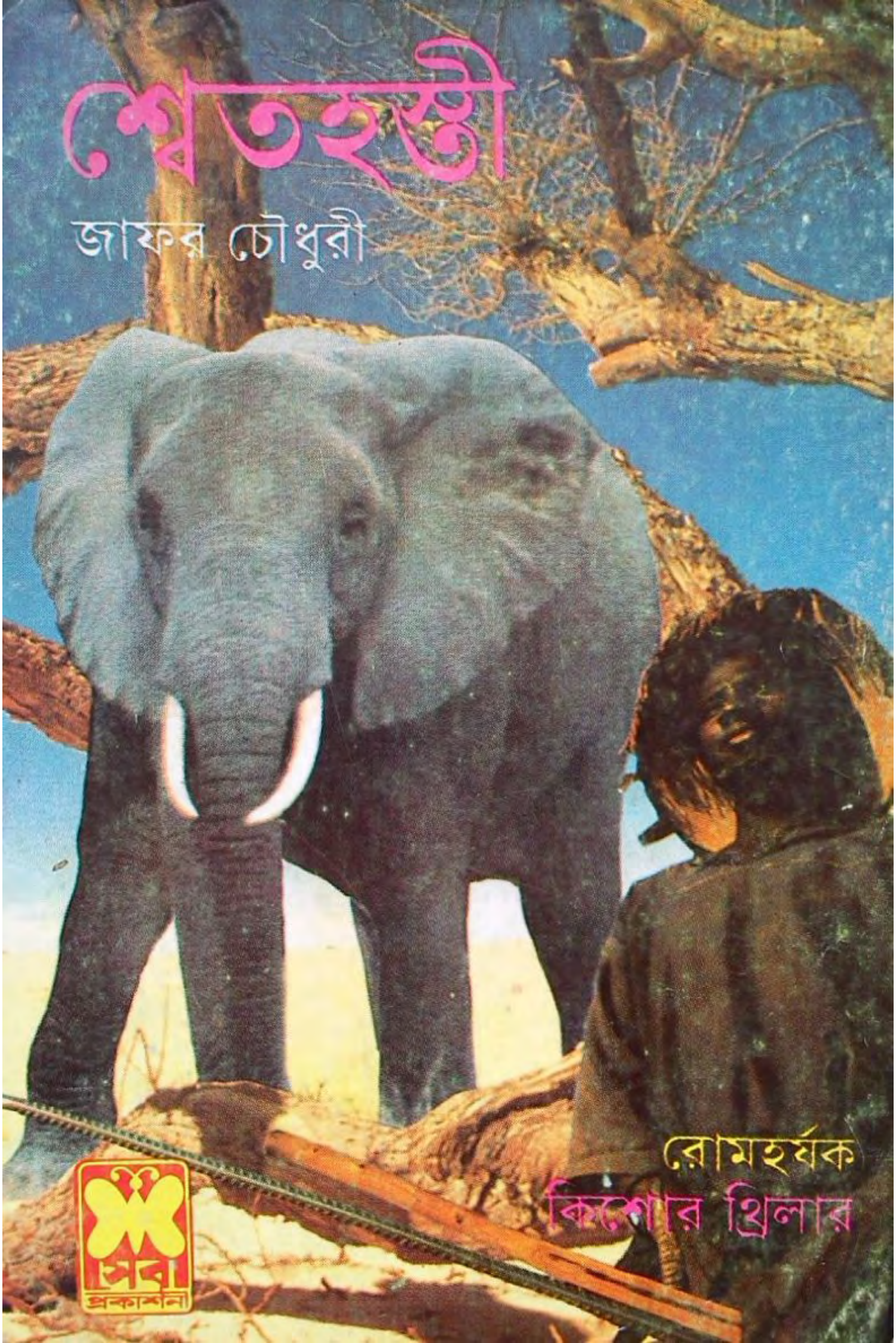

রোমহর্ষক
কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-১১৭

রোমহর্ষক সিরিজের একাদশ উপন্যাস

শ্বেতহস্তী

জাফর চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1292-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHET-HOSTEE
By : Jafar Choudhury

পঁচিশ টাকা

এক

রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল বিশাল হাতিটা।

খাড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে ছেলেদের মনে হলো মেঘে ঢেকে দিয়েছে সূর্য।

মুখ তুলে দেখল ওরা, আকাশ মেঘে ঢাকেনি। ঢেকেছে শুঁড়ওয়ালা এক চারপেয়ে কালো দানব। এতবড় হাতি আর দেখেনি ওরা।

হাতিটাও ওদের মতই অবাক হয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে কুতকুতে চোখে তাকাল ওদের দিকে। গুমগুম শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে। রেগে গেছে। শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল সামনে, ওদের গন্ধ নেয়ার জন্যে।

কাঁধের সঙ্গে ভাঁজ করে লেপ্টে ফেলেছিল কান দুটো। ঝটকা দিয়ে ছড়িয়ে দিল ছাতার মত। এতটাই বড়, রেজা অনুমান করল, ওই সাইজের ডাইনিং টেবিল বানালে একেকটাতে আটজন করে লোক খেতে বসতে পারবে। রোদে ঝকঝক করছে ওটার ছয় ফুট লম্বা সাদা দাঁত।

রেজার মত শান্ত থাকতে পারল না ওর ছোট ভাই সুজা। বলল, 'চলো, পালাই।'

'কোথায়?' দুই ধারে ঘন ঝোপঝাড়ের দেয়াল হয়ে আছে।

'যেদিক থেকে এলাম,' সুজা বলল।

'দৌড় দিয়ে লাভ হবে না। তাড়া করবে। হাতির সঙ্গে পারা যাবে না। ধরে ফেলবে। আর ছয়-সাত টন ওজনের হাতির এক পায়ের পাড়াই যথেষ্ট, ভর্তা হয়ে যাব।'

'তাহলে কিছু একটা করো! এ সব যুক্তি তো আর প্রাণ বাঁচাবে না।'

সামনের দিকে শুঁড়টাকে ছুঁড়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল দানব। রক্ত হিম করা চিৎকার। কলরব করে ছুটে পালাতে শুরু করল বানর আর পাখির দল।

পেছনে তাকাল রেজা। ওদের ভাড়া করে আনা নিগ্রো কুলির দল আতঙ্কিত হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বাদে। তার নাম আকামি। ওদের গাইড এবং ট্র্যাকার। সে দাঁড়িয়ে আছে ওর একেবারে পাশেই। হাতে একটা হাতি মারার রাইফেল। সেটা রেজার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

মাথা নাড়ল রেজা। 'জ্যান্ত ধরার চেষ্টা করব।'

মুচকি হাসল আকামি। নিজে সে দুঃসাহসী লোক, সাহসী মানুষদের পছন্দ করে। কিন্তু হাতি ধরার কথা সে-ও কল্পনা করতে পারে না।

সামনে এগোনোর সাহস নেই, পিছিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে,

দু-ধারে মাউন্টেইনস অভ দা মুন, অর্থাৎ চন্দ্রপাহাড়ের কুখ্যাত ঘন ঝোপঝাড়ের দেয়াল। সময় থাকলে হয়তো কুপিয়ে কেটে পথ করে নেয়ার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু হাতিটা ওদেরকে সে-সময় দেবে বলে মনে হলো না।

মাটিতে গর্ত থাকলে নির্দ্বিধায় তাতে ঢুকে যেত এখন, তা-ও নেই।

একটা মাত্র পথ খোলা আছে, ওপর দিকে। কিন্তু সেদিক দিয়ে পালাতে হলে ডানা দরকার, উড়ে যেতে হবে। তার মানে, পালানোর পথ নেই।

দ্রুত ভাবনা চলেছে রেজার মাথায়। তাকিয়ে আছে ওপর দিকে।

'লিয়ানা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। মাথার ওপরে বড় বড় গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ওই লতা। জাহাজ বাঁধার দড়ির মত শক্ত।

'ধরব কি করে?' কি করতে হবে বুঝে গেছে সুজা।

'আমার কাঁধে ওঠ্,' রেজা বলল।

ভাইয়ের কাঁধে উঠল সুজা। হাত বাড়িয়ে একটা লতা ধরে দোল দিয়ে উঠে যেতে শুরু করল ওপরে।

এ আবার কি হচ্ছে!—অবাক হয়ে ভাবছে যেন হাতিটা। তাকিয়ে রয়েছে আজব ওই দড়াবাজিকরের দিকে।

আকামিকে নির্দেশ দিল রেজা, 'যাও, ওঠো, জলদি!'

রেজাকে ছেড়ে আগে ওঠার ইচ্ছে ছিল না আকামির।

কিন্তু তর্ক করে নষ্ট করার সময় এখন নেই। রাইফেলটা স্ট্র্যাপে ঝুলিয়ে, রেজাকে মই বানিয়ে সুজার মতই উঠে যেতে শুরু করল সে-ও।

বিকট হস্তীনিনাদ করে দুলকি চালে এগোতে লাগল হাতি। লিয়ানার ডগায় ফাঁসের মত গিঁট বেঁধে থাকে। সে-রকম একটা গিঁটে পা ঢুকিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল আকামি। হাত বাড়াল রেজাকে ধরার জন্যে।

বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল রেজা। তাকে টেনে তুলে নিতে লাগল আকামি।

কিন্তু সার্কাসের এই খেলা মোটেও পছন্দ হলো না হাতির। ধরার জন্যে ছুটে এল সে। রেজার নিচে দাঁড়িয়ে আরেকবার হাঁক ছাড়ল। শুঁড়ের ফুটো থেকে বেরোনো গরম নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগল পায়ে। রেজার গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরল শুঁড়টা।

আকামি টানছে ওপর দিকে, হাতি টানছে নিচে। ঘাবড়ে গেছে রেজা। ভয়ঙ্কর এক মুহূর্ত। এই টানাটানি বন্ধ না হলে ছিঁড়ে দুই টুকরো হয়ে যাবে সে। আকামি তাকে ছেড়ে দিলেও বিপদ। নিচে পড়বে। পায়ের তলায় পিষে মারবে তখন দানবটা।

চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল কুলিরা। টিন বাজিয়ে, নানা রকম শব্দ করে হাতির দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল।

ওদের দিকে ফিরে ভয় দেখানোর জন্যে চিৎকার করে

উঠল হাতি।

আওয়াজটা অদ্ভুত। ভয়াবহ সন্দেহ নেই, তবে বাঘ-সিংহের গর্জনের মত নয় শব্দটা, বরং অনেকটা মেয়েমানুষের চিৎকারের মত; তবে অনেক গুণ জোরাল, গায়ের রক্ত জমিয়ে দেয়।

কুলিদের হট্টগোলের জবাবটা দিয়েই আবার রেজার দিকে নজর ফেরাল সে। যেন বলতে চাইল—*দাঁড়াও, তোমাদেরও ধরব, আগে হাতের কাজটা শেষ করে নিই!*

আবার টান দিল রেজার পা ধরে।

ওপরে হড়াৎ করে পিছলে গেল কিছু। এই সম্ভাবনাটার কথা ভাবেনি রেজা। লতাটা বোধহয় খুলে আসছে ডাল থেকে। নতুন বিপদ। লতা ছিঁড়ে গেলে শুধু সে-ই না, আকামিও পড়বে—দুজনেই মরবে তখন।

'ছাড়ো! আমাকে ছেড়ে দাও!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।

কিন্তু ছাড়ল না আকামি। রেজার কব্জিতে আরও চেপে বসল আঙুলগুলো।

আরও একটা জিনিস পিছলে যেতে শুরু করল টানাটানিতে। রেজার গোড়ালি ঢাকা ভারি বুট, সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্যে পরেছিল। পট করে ছিঁড়ে গেল ফিতে। দ্রুত পিছলে পা থেকে খসে বেরিয়ে গেল জুতোটা।

মুক্ত হয়ে গেল পা। টেনে তাকে তুলে নিল আকামি।

তারপর দু-জনে মিলে বেয়ে উঠে গেল উঁচু ডালে।

জুতোটাকে নিয়ে পড়ল হাতি। আছাড় দিয়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, দাঁত দিয়ে খুঁচিয়ে ওটাকে ছিঁড়ে, চ্যাপ্টা করে মাটিতে পুঁতে ফেলল। তারপর ঢেকে দিল লতাপাতা দিয়ে।

শিকারকে শেষ করে এ ভাবে কেন ঢেকে দেয় আফ্রিকান হাতি, এটা একটা বিস্ময়। এর জবাব কেউ জানে না।

রেজা ভাবল, শান্ত হয়ে এবার চলে যাবে হাতিটা। কিন্তু গেল না ওটা। আবার নজর দিল ওদের দিকে। কুতকুতে চোখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দেখল গাছের মানুষগুলোকে। হঠাৎ এসে বিশাল মাথা দিয়ে ঢুস মারল গাছের গায়ে।

থরথর করে কেঁপে উঠল গাছ। ঝাঁকুনির চোটে ওপরের ডাল থেকে চিৎকার করে খসে পড়ল একটা বানর। মাটিতে পড়ল না। ধরে ফেলল আরেকটা ডাল।

প্রমাদ গুণল রেজা-সুজা। হাতির এই আচরণের কথা ওরা শুনেছে। একেক সময় এমন খেপা খেপে যায় ওরা, গাছ থেকে ফেলে হলেও শিকারকে ধরার চেষ্টা করে। এই হাতিটাও একই কাজ করছে।

সামনের ডান পা-টা গাছের গায়ে তুলে দিয়ে ঠেলতে লাগল সে। মোপানি গাছ। শিকড় খুব শক্ত। তাই সামান্য একটু বাঁকা হলো মাত্র, কাত হলো না।

ছাড়ল না হাতি। ফেলেই ছাড়বে। দাঁত দিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি খুঁড়তে শুরু করল। সেই সঙ্গে ছিঁড়তে

লাগল শেকড়। গোড়াটা নরম করতে পারলেই, ব্যস।

চুপ করে বসে থাকলে মরতে হবে, চিৎকার করে ডেকে বলল রেজা, 'মুংগা, শেকল!'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতিটার কাণ্ড দেখছে কুলিরা। ডাক শুনে নড়ে উঠল তাদের একজন। আরও কয়েকজনের সাহায্যে মোটা একটা শেকলের এক মাথা তাড়াতাড়ি বেঁধে দিয়ে এল বিশাল টিলার চোখা মাথায়। আরেক মাথায় একটা ফাঁস বানিয়ে দৌড়ে এল হাতির এক পায়ের নিচে পেতে দেয়ার জন্যে। হাতি তাতে পা দিলেই ফাঁস টেনে আটকে দেবে।

মাথা সোজা করে আবার গাছ ঠেলতে আরম্ভ করেছে হাতি। ভয়াবহ ঝাঁকুনি লাগছে। বানরের দল পালিয়ে গেছে অন্য গাছে। রেজা-সুজারাও এ কাজ করতে পারলে বেঁচে যেত। কিন্তু ওরা তো বানরের মত লাফাতে পারে না। কেবল প্রাণপণে গাছ আঁকড়ে ধরে রইল।

মুংগার ওপর নজর পড়ল হাতির। বিকট চিৎকার দিয়ে ঘুরল।

শেকল ফেলে দৌড় মারল মুংগা। কিছুদূর তাকে আর কুলিদেরকে তাড়া করে গেল হাতি। চোখের পলকে যে যেদিকে পারল ছুটে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

আবার গাছের কাছে ফিরে এল হাতি।

গুলি করা ছাড়া উপায় নেই। ভারি .৫০০ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা হাতির দিকে তাক করতে গেল আকামি।

ধরে ফেলল সুজা, 'আমাকে দাও।'

তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল আকামি, এত ভারি রাইফেল দিয়ে সুজা গুলি চালাতে পারবে না ভেবে।

'আরে দূর, দাও না! কি ভেবেছ আমাকে? ভারি রাইফেল চালিয়েছি আরও। দু-শো ফুট দূর থেকে ছোট্ট খাবারের টিন ফুটো করে দিতে পারি। আর এটা তো হাতি, বাড়ির সমান।'

অনুমতির আশায় রেজার দিকে তাকাল আকামি।

হাসল রেজা। মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল দেয়ার জন্যে।

রাইফেলটা নিয়ে গুলি করতে যেতেই আবার ঘুরে দাঁড়াল হাতি। আবার বিরক্ত করতে এসেছে তাকে মুংগা আর তার লোকেরা। খেপে গিয়ে আরেকবার কালো দু-পেয়ে জীবগুলোকে তাড়া করল সে।

আবার সরে গেল লোকগুলো।

কি করে এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় ওরা, ভেবে অবাক লাগল সুজার। ভাবল, এ যাত্রা বাঁচতে পারলে কুলিদের কাছ থেকে কায়দাটা রপ্ত করবে ভাল মত। কাজে লাগবে ভবিষ্যতে।

আবার গাছের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল জানোয়ারটা। তাজ্জব ব্যাপার! ভয়ানক জেদ হাতির। যার পেছনে লাগবে তাকে শেষ না করে আর রাগ যায় না।

আর ওটাকে কাছে আসার সুযোগ দিল না সুজা। গুলি করল।

ভারি রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল হাতিটা। মাটিতে কাত হয়ে পড়ল না, ভাঁজ হয়ে গেল সামনের দুই হাঁটু, যেন আস্তে বসে পড়ল মাটিতে, একটুও শব্দ না করে।

গুলি করার পর আরেক কাণ্ড ঘটেছে। গাছের ডালে বেকায়দা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গুলি করেছে সুজা, রাইফেলের সাংঘাতিক ধাক্কা সইতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। পাথরে পড়লে হাড়গোড় ভেঙে মরত, কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল, গাছের গোড়ায় এখানে একধরনের শ্যাওলা হয়ে আছে। ওগুলোতে পড়ল। এত বড় আর মোটা শ্যাওলা পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। অনেক পুরু গালিচা তৈরি করে রেখেছে যেন, ফলে তাতে পড়ে বেঁচে তো গেলই সে, কোন আঘাতও পেল না।

রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। উঠে দাঁড়াল। চোখ পড়ল বিশাল হাতিটার ওপর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না এতবড় একটা দানবকে এত সহজে মেরে ফেলেছে। দুঃখও হচ্ছে। হাতি শিকার করতে আফ্রিকায় আসেনি ওরা, এসেছে বিশাল ওই প্রাণী জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে।

রেজাও নেমে এল গাছ থেকে। এগিয়ে গিয়ে হাতির কাঁধে বিঁধে থাকা একটা বল্লমের মাথার দিকে তাকিয়ে রইল। মরচে পড়ে গেছে। কেউ ছুঁড়ে মেরেছিল, মাংসে গেঁথে রয়েছে

ফলাটা, কিন্তু ডাণ্ডাটা ভেঙে গেছে। পচে ঘা হয়ে গেছে। এ কারণেই বোধহয় মানুষের ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল প্রাণীটা।

মাথার কাছে একটা বড় ফুটো। সেটা দেখিয়ে আকামি জিজ্ঞেস করল সুজাকে, 'এখানে গুলি করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল সুজা।

চট করে রেজার দিকে তাকাল আকামি। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু-জনের। তাড়াতাড়ি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল সে—শেকলটা তুলে এনে ফাঁস পরিয়ে দিল হাতির পায়ে।

অবাক লাগল সুজার। জিজ্ঞেস করল, 'মরা হাতিকে বাঁধছ কেন?'

'মরেনি,' জবাব দিল রেজা।

'মানে? মগজে বুলেট খেয়ে পড়ে গেল, মরেনি মানে?'

'হাতি শিকারে তোর অভিজ্ঞতা নেই তো, তাই বলছিস। হাতির মাথার সামনের দিকটায় শুধুই হাড়, পুরু শক্ত হাড্ডি। এই হাড়ে ঢুকে আটকে যায় বুলেট, মগজ পর্যন্ত যেতে পারে না। মগজ অনেক পেছনে, দুই চোখের মাঝামাঝি জায়গায়। গুলির আঘাতে কেবল বেহুঁশ হয়েছে ওটা, শীঘ্রি জেগে যাবে।'

হাঁ হয়ে গেল সুজা। কথাটা জানে না বলে নিজের ওপর রাগ হলো, তবে খুশিও হলো, প্রাণীটাকে খুন করতে হয়নি বলে।

রেজার কথাই ঠিক।

গলার গভীর থেকে ভারি একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠে এল

হাতিটার। তারপর চাপা গোঙানি। কাছাকাছি ছিল যারা, তাড়াতাড়ি সরে গেল।

চোখ মিটমিট করল হাতিটা। শুঁড় নাড়ল। তারপর বিকট চিৎকার করে আবার খাড়া হয়ে উঠল। তাড়া করতে গেল কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কুলিকে।

কিন্তু পায়ে আটকানো শেকল ঠেকিয়ে দিল তাকে।

পিছিয়ে গিয়ে, আরেকবার চিৎকার করে আবারও তেড়ে গেল হাতি। সাংঘাতিক টান লাগল শেকলে। আর তাকে আটকাতে পারল না শেকল, মট করে ছিঁড়ে গেল।

উধাও হয়ে গেছে কুলিরা।

কাউকে না পেয়ে মোপানি গাছটার দিকে তাকাল সে। কেউ নেই দেখে নিরাশ হয়েই যেন আরেকবার চিৎকার করে, রওনা হয়ে গেল বনের দিকে। পাথরে ঘষা লেগে লেগে শেকলের শব্দ উঠছে ঝনঝন, ঝনঝন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দ।

খানিক দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সুজা আর রেজা।

স্তব্ধ হয়ে গেছে দু-জনে। এত শক্ত শেকল এমন করে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে হাতিটা, কল্পনা করেনি।

জোর গুঞ্জন করে উঠল কুলিরা।

দুই

কান পেতে শুনছে সবাই। হাতির চিৎকার থেমে যেতে হঠাৎ বড় বেশি নীরব মনে হলো বনটাকে। কেমন যেন গা শিউরানো পরিবেশ। মনে হচ্ছে, এর চেয়ে হাতির চিৎকারও ভাল ছিল।

'চলো, এগোই,' রেজা বলল।

আকামি জানাল, 'কুলিরা আর এগোতে চায় না।'

'কেন?'

'ওরা বলছে এটা খারাপ জায়গা। এখানে কিছু ধরতে পারব না আমরা। এখানে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। এ রকম জায়গা নাকি আর কখনও দেখেনি ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল রেজা। সে-ও দেখেনি কখনও। মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। আশপাশের দানবদের তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র লাগছে।

বড় বড় গাছগুলো এমন করে ছেয়ে আছে শ্যাওলায়—দেখে মনে হয় বুড়ো মানুষের দাড়ি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে দুলছে। ডালে ডালে জড়াজড়ি করে আছে শত শত ফুট লম্বা লতা। যখন

তখন নেমে আসছে আকাশের মেঘ, গাছপালা ভেদ করে মাটি ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে, যেন শিকার দেখে ছোঁ মারার জন্যে নামছে আকাশচারী দানব।

ঘন হয়ে ঝুলে আছে কুয়াশার মত বাষ্প।

ভাবা যায় একটা ফুল একটা ঘরের সমান বড়! ইউরোপ আমেরিকায় হাঁটু সমান উঁচু ফুল দেখেছে সে, কিন্তু এখানে ওগুলো চারজন মানুষের সমান উঁচু। আমেরিকায় যে বীজ পাখিতে খায়, সেটা এখানে পাখির চেয়ে বড়। যে সব ফার্ন সাধারণত হাঁটুর চেয়ে উঁচু হয় না, এই চন্দ্রপাহাড়ে সেগুলোই বড় বড় গাছ। সব কিছুই অস্বাভাবিক বড়।

অদ্ভুত এক জগৎ! শুরুতে তো রেজা বিশ্বাসই করতে পারছিল না বাস্তবে রয়েছে। চিমটি কেটেও দেখেছে নিজের গায়ে ব্যথা পায় কিনা।

গাছপালার মতই এখানকার প্রাণীরাও বড়। হামিংবার্ড দেখেছে কবুতরের সমান। চিতাবাঘগুলো হয় বাঘের চেয়ে বড়। দেখতে দেখতে একসময় সুজা বলেছে, 'যা অবস্থা, কেঁচো দেখব সাপের সমান!'

মাথা ঝাঁকিয়েছে রেজা, 'তাই তো হয় এখানে। কেঁচো হয় তিন ফুট লম্বা। মাউনটেইনস অভ দা মুনের ওপর একটা সাইন্টিফিক রিপোর্ট করেছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিন, উনিশশো বাষট্টির মার্চে বেরিয়েছিল সংখ্যাটা। এখানকার দানবীয় প্রাণীদের উল্লেখ আছে তাতে। অভিযাত্রীরা দেখে

গেছে তিন ফুট লম্বা কেঁচো।'

'তাহলে এই আজব জায়গা সম্পর্কে কিছু শোনা যায় না কেন?'

'যায় না কে বলল? ম্যাপ দেখলেই পেয়ে যাবি। ভিকটোরিয়া হ্রদের কাছে, অনেক ট্যুরিস্ট যায়। ম্যাপে নাম রুয়েনজোরি। এর মানে রেইনমেকার, বা বৃষ্টিপ্রস্তুতকারী। সারাক্ষণই বৃষ্টি হতে থাকে এখানে। আর এর জন্যেই কোন ট্যুরিস্ট রিসোর্ট গড়ে ওঠেনি। মানুষের চোখে না পড়ার আরেকটা বড় কারণ হলো, বেশির ভাগ সময়ই মেঘে ঢাকা পড়ে থাকে এই অঞ্চল।'

'বাব্বাহ্! এই অবস্থা! নামটা রুয়েনজোরি, না? আমি তো জানতাম মাউন্টেইনস অভ দা মুন।'

'এটা রুয়েনজোরির আরেক নাম।'

'পুরানো, না নতুন?'

'পুরানো। প্রাচীন মিশরীয়রা রেখেছিল।'

'কেন?'

'আজব জায়গা বলে। পৃথিবীতে এমন অবস্থা আর কোথাও নেই। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। তাই পুরানো ম্যাপে নাম ছিল লুনায়ে মনটিস, অর্থাৎ মাউনটেইনস অভ দা মুন, অর্থাৎ চাঁদের পাহাড়। এক হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে ম্যাপে ওই নাম থাকার পর হঠাৎ করেই মুছে ফেলা হলো। হয়তো লোকে তখন মনে করেছিল এ রকম জায়গা বলে কিছু নেই। কারণ

পরের দিকে অভিযাত্রীরা আর এজায়গাটা খুঁজে পায়নি। বিখ্যাত পর্যটক স্টেনলি—লিভিংস্টোনকে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি, তিনি একবার বললেন—ম্যাপে যে জায়গায় চাঁদের পাহাড় দেখানো রয়েছে, ওই জায়গাতে শুধু পানি, জাহাজে করে পার হয়েছি আমি; তার মানে ওখানে পাহাড় বলে কিছু নেই। সুতরাং ম্যাপ থেকে মুছে ফেলা হলো তখন। পরে আবার ফিরে এলেন তিনি। আফ্রিকার এই এলাকা ধরে যাওয়ার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেঘ সরে গেলে বেরিয়ে পড়ল পর্বতের চূড়া—চিরতুষারের রাজত্ব, দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ফিরে গিয়ে চাঁদের পাহাড়ের জায়গায় নতুন নাম বসালেন, রুয়েনজোরি।'

'আগের নামটাই ভাল ছিল। শুনতে একটু কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু এক ধরনের রোমান্টিকতা আছে। আমরা আরও সহজ করে চাঁদের পাহাড়ই বলব, কি বলো?'

'অসুবিধে নেই।'

এহেন রহস্যময় চাঁদের পাহাড়ের আরও গভীরে যে যেতে রাজি হবে না নিগ্রো কুলিরা, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বিশেষ করে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া হাতি জ্যান্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর। হাতির মাথায় কোথায় গুলি লাগাতে হয়, ওরাও জানে না। কারণ বন্দুক দিয়ে শিকার করেনি ওরা, করেছে বর্শা আর তীর-ধনুক দিয়ে।

অধৈর্য হয়ে বলল সুজা, 'সারাদিন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব

নাকি? যেতে বলছ না কেন? ধমক লাগালেই হয়।'

মাথা নাড়ল রেজা, 'লাভ হবে না। ধমক দিয়ে কোন আফ্রিকানকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবি না, নিজের ইচ্ছেয় যদি না যায়। যেতে বাধ্য করলে বিপদে ফেলে দেবে। সাংঘাতিক কুসংস্কার এদের, বনের বাঘ-সিংহকে পরোয়া করে না, কিন্তু ভূতের ভয়ে কুঁকড়ে যায়। এদের বেশির ভাগেরই ধারণা প্রতিটি বড় ঝোপ, প্রতিটি পাথর একটা করে ভূতের বাসা। যত বড় ঝোপ হবে, ভূতটাও হবে তত বড়। সময় দিতে হবে ওদের, বুঝতে দিতে হবে, দানবীয় এই গাছপালা আসলে কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

সময় কাটছে। কুলিদের বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করল আকামি। অনেকক্ষণ পর যখন দেখল ওরা, এই 'দানব বনের' ভূত তাদের কোন ক্ষতি করছে না, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরও কিছুদূর এগোতে রাজি হলো।

একটা বুট নষ্ট করে ফেলেছে হাতি। আরেকটা পায়ে রেখে কোন লাভ নেই। সেটাও খুলে ফেলে দিয়ে আরেক জোড়া বুট পরে নিল রেজা।

যেটা ফেলে দিল, মহানন্দে সেটা তুলে নিল হামবি নামের এক কুলি সর্দার। পায়ে টায়ার কেটে তৈরি একজোড়া স্যাণ্ডেল। সেগুলো খুলে রেখে বুটটা পরে ফেলল সে। আরেক পায়ে জুতোর মত করে পাতা জড়িয়ে লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকাল সঙ্গী কুলিদের দিকে। এত সুন্দর জুতো জীবনে আর পরেনি সে।

তিন

লোকে কথায় বলে—গর্বে মাটিতে পা পরে না। কিন্তু নতুন জুতোর গর্বে আরও বেশি করে পা ফেলতে লাগল হামবি, নতুন শক্তি দিল যেন বিচিত্র জুতোজোড়া। হাসতে হাসতে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল সে। কিন্তু আচমকা থমকে দাঁড়াল, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। পাহাড়ী পথ বেয়ে একটা ভূতকে নেমে আসতে দেখেছে।

কুয়াশায় জড়িয়ে থাকায় ভূতটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ভূত মনে হওয়ার কারণ, মানুষের মত দেখতে হলেও ওটা বেজায় লম্বা। তার ধারণা মানুষ এত লম্বা হতে পারে না।

পেছনের কুলিরাও দেখে ফেলল ভূতটাকে। আতঙ্কে, উত্তেজনায় একে অন্যের গায়ে গুঁতো দিয়ে কলরব শুরু করে দিল ওরা। দু-একজন ঘুরে দৌড় দেয়ারও চেষ্টা করল, ধরে ফেলল আকামি।

দমকা বাতাসে সরে গেল কুয়াশা। স্পষ্ট দেখা গেল এখন মানুষটাকে, ভূত নয়। কিন্তু তবু কুলিদের কারও বিশ্বাস হতে

চাইল না।

ওরা যে অঞ্চল থেকে এসেছে, সেখানকার মানুষ পাঁচ ফুটের ওপরে কয়েক ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ উয়াটুসিদের কখনও দেখেনি ওরা, যারা সাত ফুটের বেশি লম্বা হয়।

উয়াটুসিরা নিগ্রো নয়, সাদা মানুষও নয়, ওদের চামড়া উজ্জ্বল তামাটে রঙের। মাথা সোজা করে চলার স্বভাব, চলেও দ্রুতগতিতে, যেন দমকা বাতাস। ভাল নাচতে পারে, লাফ দিয়ে উঠতে পারে অনেক উঁচুতে।

'কিং সলোমনস মাইনস ছবি থেকে উঠে এসেছে দেখি!' বিড়বিড় করল রেজা।

মাথা ঝাঁকাল সুজা। ফিল্মটা সে-ও দেখেছে। ওই ছবিতে উয়াটুসিদের একটা চমৎকার দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়েছে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে নেমে আসা লোকটার গা একটা সাদা চাদরে মোড়া, হাতে লম্বা লাঠি। বিদেশীদের দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছে, কিন্তু ভয় পেল না। নিজের চেয়ে আকারে ছোট মানুষকে ভয় করে না উয়াটুসিরা।

এগিয়ে আসছে লোকটা। পাশ কাটানোর সময় সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম জানাল।

'আকামি,' রেজা বলল, 'ওকে থামতে বলো। ওর সঙ্গে কথা বলব।'

সব আফ্রিকান গোত্রেরই মোটামুটি নিজস্ব একটা ভাষা

থাকে, উয়াটুসিদেরও আছে। সেটা জানে না আকামি। সুতরাং সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলল সে—আফ্রিকার অনেক জায়গার লোকেই এই ভাষাটা বোঝে।

বুঝল লম্বা লোকটা। মাথা ঝাঁকাল। তবে সোয়াহিলিতে না বলে রেজার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'কি করতে পারি, বলো?'

অবাক হয়ে গেল রেজা, 'আপনি ইংরেজি জানেন!'

হাসি ফুটল তামাটে মুখটায়। 'এত বছর ধরে ইংরেজরা মাতব্বরি করল আমাদের ওপর, ভাষাটা জানব না? তবে আমি শিখেছি সিনেমায় কাজ করার সময়।'

'সিনেমা?'

'হ্যাঁ, একটা ছবিতে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। অভিনয়।'

'নেচেছেন?'

'নেচেছি, লাফিয়েছি, কথাও বলেছি।'

'লাফিয়েছেন?' কথাটা ধরল সুজা। 'তারমানে ওটা সাংঘাতিক লাফ, নইলে সিনেমায় নিতে যাবে কেন?'

'তা বলতে পারো।'

'আপনার নামটাই কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও,' রেজা বলল।

'আমার নাম ওগারো। আমি একটা গাঁয়ের মোড়ল।'

ও, তারমানে সাধারণ লোক নয়। ইংরেজি জানে, গাঁয়ের

সর্দার···নিজের, সুজার আর আকামির পরিচয় দিল রেজা।

সুজা বলে বসল, 'পরিচয় তো হলো, এবার আপনার লাফ দেখাবেন? শুনেছি উয়াটুসিরা অনেক উঁচুতে উঠতে পারে লাফ দিয়ে, কথাটা সত্যি?'

ওগারো হাসল, 'সত্যি না হলে কি আর সিনেমার জন্যে ছবি তোলে?'

তা-ও তো বটে। একমুহূর্ত ভাবল সুজা, 'লাফ দিয়ে কত ওপরে উঠতে পারবেন আপনি?'

'কতটা উঠতে বলো?'

আবার ভেবে নিল সুজা। রেজাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার ভাইয়ের মাথার ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবেন?'

পরামর্শটা ভাল লাগল না রেজার। সুজার দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখ কি বলছিস। যদি পার হতে না পারে, লাথি লাগবে আমার মুখে।'

'লাগবে বলা যায় না, লাগতে পারে,' মুচকি হাসল সুজা। 'ওগারোকে বাদ দিলে, এখানে তুমিই সবার চেয়ে লম্বা। সে-জন্যেই তোমাকে দেখালাম।'

সব শুনতে পেল ওগারো। 'আরেক কাজ করো বরং। রেজা, তুমি তোমার ভাইকে কাঁধে বসিয়ে নাও। লাফিয়ে তার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাব আমি।'

হেসে ফেলল রেজা। তাড়াতাড়ি কাঁধ নিচু করে দিল। তাকে জব্দ করতে চেয়েছিল সুজা এখন পড়েছে বেকায়দায়।

কি আর করবে সুজা, নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে। উঠে বসল ভাইয়ের কাঁধে। দুই পা ঝুলিয়ে দিল রেজার বুকের ওপর।

'কেমন লাগছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল রেজা।

রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল সুজা।

শব্দ করে হেসে ফেলল রেজা। তরল স্বরে বলল, 'মন খারাপ করিস না। লাথি খেয়ে মরার ভয় পাচ্ছিস তো? ভয় নেই, সবাইকে একদিন মরতে হবে—আগে আর পরে। তুই না থাকলে তোর জন্যে সত্যি খারাপ লাগবে আমার, সুজা। আহা, এতগুলো বছর একসঙ্গে ছিলাম, কত জ্বালিয়েছিস তুই আমাকে।'

রেজার চুল খামচে ধরল সুজা। পড়ে যাওয়ার সময় সামলে নিচ্ছে এ রকম ভঙ্গি করে জোরে টেনে দিল চুলে।

'আঁউ!' করে চিৎকার করে উঠল রেজা, 'এমন করলি কেন!'

'বুঝিয়ে দিলাম, এখনও মরিনি! জ্বালানো শেষ হয়নি।'

গায়ের চাদর খুলে ফেলল ওগারো। তার তামাটে রঙের সুগঠিত শরীরটা দেখতে লাগছে একটা তামার স্তম্ভের মত।

ছেলেরা ভাবল, কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে লাফ দেবে সে, হাই জাম্প যেভাবে দেয়া হয়। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ওগারো। হঠাৎ করে হাঁটু ভাঁজ করে আবার সোজা করে ফেলল, শন্যে লাফিয়ে উঠল ঘড়ির মত। রেজার

মাথা ছাড়াল পা, তারপর সুজার। ওর মনে হলো বিশাল পা দুটো এসে বাড়ি মারবে মুখে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

কিন্তু মাথার ওপর এক ঝলক দমকা বাতাস ছাড়া আর কিছু টের পেল না। চোখ মেলে দেখতে পেল তার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে সর্দার। এতবড় একটা পরিশ্রমের পরও সামান্যতম হাঁপাচ্ছে না। চাদরটা তুলে নিয়ে আবার গায়ে পেঁচাল।

'আর কিছু করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'করলে খুবই উপকার হয়,' রেজা বলল। 'তবে তার আগে বলে নিই, আমরা কেন এখানে এসেছি। আমরা এসেছি জন্তু-জানোয়ার ধরতে। চিড়িয়াখানা, সার্কাস, ফিল্ম কোম্পানির দরকার হয় এ সব জানোয়ার। তাদের কাছে বিক্রি করব। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।'

'জানোয়ার ধরা খুব বিপজ্জনক কাজ। একা করা কঠিন।'

'একা নই আমরা। তিরিশজন লোক আছে। সবাই আফ্রিকান। আফ্রিকা চেনে ওরা, কোন্ জানোয়ার কোথায় থাকে, ওদের স্বভাব কেমন, জানে।'

মাথা নাড়ল সর্দার। 'ওরা জানে কেবল খুন করতে। জ্যান্ত ধরতে জানে না।'

'কিন্তু আমার লোকেরা শিখে ফেলেছে। কয়েক মাস ধরে আমাদের সঙ্গে আছে ওরা। অনেক জানোয়ার ধরেছি—জিরাফ, মোষ, হায়েনা, চিতাবাঘ, বেবুন, জলহস্তী, অজগর সাপ, দাঁতালো শুয়োর, বুশ-বেবি, হানি ব্যাজার, আরও অনেক

কিছু।'

'ও, তাহলে তো অনেকই এগিয়েছ। নিয়েই ফেলেছ সব।'

'না, এখনও বাকি আছে। সবচেয়ে বড়টাকেই ধরা হয়নি এখনও।'

'হাতির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। সাধারণ হাতি আগেই ধরতে পারতাম। তবে আমরা চাই চন্দ্রপাহাড়ের হাতি। বাচ্চা একটা হাতি অবশ্য চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ওটার মা-কে মেরে ফেলেছে পোচাররা। আমার ভাই ওটাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিল। চলে এসেছে তার সঙ্গে। নেওটা হয়ে গেছে। খাঁচার বাইরে থাকলে তাকে ছেড়ে এক পা নড়বে না।'

হাসল সর্দার। 'কিন্তু এখানকার হাতি তো ধরতে পারবে না।'

'কেন পারব না?'

'এগুলো অনেক বড়, অনেক শক্তি গায়ে। চন্দ্রপাহাড়ের হাতির মত শক্তিশালী আর কোন জানোয়ার পৃথিবীতে নেই। কারণ ওরা পাহাড়।'

এই প্রথম লোকটার চোখে ভয় দেখতে পেল রেজা। জিজ্ঞেস করল, 'পাহাড়ের মত বড় বলতে চাচ্ছেন তো?'

'না, আসল পাহাড়ই বলতে চাইছি।'

সচল কুয়াশায় ডুবছে-ভাসছে যেন পেছনের আর আশপাশের পাহাড়গুলো।

'সাধারণ জায়গা মনে কোরো না এটাকে,' সর্দার বলল, 'জাদুর ছড়াছড়ি এখানে। চেহারা দেখে এখানে জিনিস চেনা মুশকিল। দেখতে যা, আসলে সেটা নয়, অন্য কিছু। মস্ত ধোঁকা। আমাকে পাগল ভাবছ তো? বোকা? কোনটাই আমি নই। আমাদের ওঝারাও বোকা নয়। তাদের কথা বিশ্বাস করি আমরা। এই ভূমি হাতিদের পবিত্র স্থান। কুয়াশায় ঢেকে দেয় পাহাড়-পর্বত, হঠাৎ দেখবে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। পরক্ষণেই নেই, সেখানে আবার পাহাড়। দেখলে কে অবিশ্বাস করবে যে হাতি আর পাহাড় এক নয়? সুতরাং বুঝতেই পারছ, হাতির সঙ্গে লাগতে যাওয়া আর পর্বতের বিরুদ্ধে লড়াই করা এখানে একই কথা।'

আজব বিশ্বাস, ভাবল রেজা। ঘুরে ঘুরে ফিরছে কুয়াশার স্তর, তার মধ্যে দানবীয় ফুল, অজগর সাপের মত মোটা মোটা লতাগুলোকে কেমন অপার্থিব লাগছে। 'আপনি বলতে চাইছেন হাতি যদি ধরেও ফেলি, ওটা পরে পাহাড় হয়ে যাবে?'

'তা বলছি না। বিদেশী মানুষের জাদু আমাদের জাদুর চেয়ে অন্য রকমও হতে পারে। আমি বলছি, হাতি ধরায় আমাকে সাহায্য করার অনুরোধ কোরো না। উয়াটুসিরা অসহায়।'

'বেশ, হাতি ধরতে নাহয় না-ই গেলেন। কিন্তু আরও সাহায্য করতে পারেন আমাদের।' গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে গুজগুজ, ফিসফাস করছে কুলিরা। 'এগোতে সাহস পাচ্ছে না

ওরা। একটু বোঝাবেন? বলবেন, সামনে কোন বিপদ নেই?'

'কিন্তু বিপদ নেই এ কথা তো বলতে পারি না। হাতির পেছনে লাগলে অবশ্যই আছে। সোজা গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢুকবে। এগিয়ে এসে পিষে মারবে তোমাকে পর্বত। ওগুলোর মধ্যে যে দুষ্ট প্রেতেরা বাস করে,' হাত তুলে আশপাশের দানবীয় উদ্ভিদগুলোকে দেখাল সর্দার, 'ওরা চোখের পলকে বুনো জানোয়ার হয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবে তোমাদের।'

ওগারোর কুসংস্কার দেখে মনে মনে হাসল রেজা, তবে মুখে সেটা প্রকাশ করল না। বলল, 'সেই ভাবনা আমাদের। বেশ, সামনে বিপদ নেই, এ কথাও নাহয় না বললেন। সামনে যে তাঁবু ফেলার নিরাপদ জায়গা আছে এটা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?'

'না, তা নেই, এ কথা খুশি হয়েই বলতে পারি। আমার গাঁয়েই থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমাদের। বেশি দূরে নয়। তোমার আর সব লোক কোথায়? এখানে তো মাত্র বারোজন?'

'এটা স্কাউটিং পার্টি,' রেজা জানাল। 'আগে আগে হেঁটে চলে এসেছি আমরা, পথঘাট চিনে নেয়ার জন্যে। মোটর চলার রাস্তা আছে কিনা দেখে গিয়ে ওদেরকে খবর দিলে ওরা আসবে। জীপ আর ট্রাক নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় অপেক্ষা করছে ওরা। খবর পেলেই রওনা হবে। এখন আপনি আমাদের সাহায্য না করলে সব ভজঘট হয়ে যাবে।'

'দেখি, কি করতে পারি,' বলে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা কুলিদের দিকে এগোল ওগারো।

মন দিয়ে সর্দারের কথা শুনল লোকগুলো। তার গাঁয়ে ওদেরকে থাকতে দেয়া হবে জেনে মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠল ওরা, ভয় কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হলো চোখমুখ। আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল।

আবার এগিয়ে চলল দলটা। নানা রকম দানবীয় উদ্ভিদের অভাব নেই পথের পাশে, কিন্তু এখন ভয় কেটে গেছে কুলিদের। তবে গাছগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকছে যতটা সম্ভব। মানুষ সমান উঁচু বিছুটির রোঁয়াগুলো বড় বড় কাঁটার মত, সুচের মত তীক্ষ্ণ। তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে এই কাঁটার খোঁচা খেলো সুজা। বুশ জ্যাকেট আর সাফারি ট্রাউজারের মত ভারি কাপড়ও অতি সহজেই ভেদ করে চামড়ায় ফুটে গেল কাঁটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে।

পথের ওপর পড়ে থাকা বিছুটির একটা ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে কাঁটাগুলো পরীক্ষা করে রেজা বলল, 'এতে লাগলে গাড়ির চাকাও ফুটো হয়ে যাবে! সাংঘাতিক শক্ত!'

এগিয়ে গিয়েছিল সর্দার। গোলমাল কিসের দেখার জন্যে ফিরে এল। সুজার হাতের আঁচড় থেকে রক্ত বেরোতে দেখে আন্দাজ করে ফেলল কি হয়েছে। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'হবেই। চিতাবাঘের নখ ধারালই হয়।'

'চিতাবাঘ পেলেন কোথায়?' অবাক হয়ে বলল সুজা, 'এ

তো কাঁটা!'

'চিতাবাঘ যখন মরে যায়, এই গাছ হয়ে যায়। আবার গাছ মরে গিয়ে চিতাবাঘ হয়।'

সর্দারের দিকে তাকিয়ে রইল রেজা। ইংরেজি জানা বুদ্ধিমান একজন মানুষের এ রকম বিশ্বাস জন্মায় কি করে? 'সব গাছপালাই কি নানা রকম জানোয়ার?'

'না, সব জানোয়ার নয়। কিছু কিছু গাছ আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা।'

'তাহলে নিশ্চয় ওসব গাছকে ভয় করার কিছু নেই। আপনার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় সব ভালমানুষ ছিলেন?'

'তা ছিলেন। ভাল এবং দয়ালু। কিন্তু মরার পর খারাপ হয়ে গেছে। খারাপ এবং নিষ্ঠুর।'

'কেন এ রকম হলো?'

'কারণ ওদেরকে খাবার এনে দিই না আমরা। দিতে পারি না। অনেক বেশি লোক। কত দেব? যাকে দিতে পারি না, সে-ই আমাদের শত্রু হয়ে যায়, রেগে গিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ধারালো নখওয়ালা জানোয়ার হয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, বিষাক্ত রস খাইয়ে আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, গায়ের ওপর পড়ে পিষে মারে।'

সর্দারের কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যেই যেন গাছ থেকে ঝরে পড়ল একটা বিশাল লবেলিয়া ফুল। লাফ দিয়ে সরে গেল নিচে যে লোকটা ছিল সে, গায়ে পড়লে মরত।

ফুলটা ভাল করে দেখল রেজা। নীল রঙের পাপড়িগুলো যেন একেকটা ইস্পাতের পাত। দশ-বারো বছরের একটা ছেলের সমান বড় ফুলটা এত ভারি, টেনে তুলতেই কষ্ট হয়।

'চমৎকার নমুনা,' বলে আকামির দিকে ফিরল রেজা। 'দু-জন লোককে আসতে বলো তো, তুলে নিক।'

হাত তুলল সর্দার। 'না না, নিয়ো না, আমার কথা শোনো। থাক এখানেই। এটা সঙ্গে নেয়ার মানে মৃত্যুকে বহন করা। দু-জন মানুষ হারাতে না চাইলে এ কাজ কোরো না।'

ফিসফিস করে ভাইকে বলল সুজা, 'লোকটা পাগল। এসো, আমরা দু-জনেই বয়ে নিই।'

'না, মাইণ্ড করে বসতে পারে। তাহলে বেকায়দায় পড়ব আমরা। ও এখানকার সর্দার, ভুলে যাসনে।'

পিপার মত ফুলটাকে ঠেলে রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দিল রেজা। 'থাক এখানে। পরে এসে নেব।'

গাঁয়ের দিকে এগোতে এগোতে আরও নানা রকম অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল ওদের। মাটিতে চার ফুট উঁচু হয়ে জন্মে থাকা শ্যাওলার পাশাপাশি গাছের গায়ে আঠারো ফুট পুরু হয়ে জন্মেছে আরেক ধরনের শ্যাওলা। ওগুলোর মধ্যে গর্ত করে বাসা বেঁধেছে পেঁচা। কোন কোন জায়গায় এমন করে ঢেকে ফেলেছে, মূল গাছটাকেই আর দেখা যায় না, মনে হয় শ্যাওলার বড় বড় স্তম্ভ। সেই সব স্তম্ভকে আবার ছেয়ে রেখেছে

অপূর্ব সব অর্কিড, কি তাদের রঙ—লাল, গোলাপী, নীল, সবুজ! রামধনুর সাতরঙের ছড়াছড়ি এখানে।

সামনে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। ওখানে ঘাসের রাজত্ব। আর ঘাসও বটে! মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যায়।

তারপর আবার বদলে গেল দৃশ্য। কলাবাগানে ঢুকল ওরা। কলাগাছ না বলে তালগাছ বলাই ভাল, কলা না বলে শসা। এত বড়।

মাটিতে পড়ে থাকা একটা কলা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে অবাক হয়ে গেল সুজা। কিছু নেই ভেতরে, কেবল বড় বড় বীচি। শাঁসটা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, বেশিদিন পড়ে থাকলে খোসার ভেতরেই শাঁসটা নষ্ট হয়ে যায়।

আরও এগোতে মানুষের কলরব শোনা গেল। বোঝা গেল, গাঁয়ের কাছে চলে এসেছে।

গাঁয়ে ঢোকার মুখে পথের পাশে একটা বিরাট ঘর। ফুলে ফুলে ঢাকা। ভেতরে তাকে তাকে সাজানো রয়েছে ফল, শস্য, আর মাংস।

'এটা কি?' সর্দারকে জিজ্ঞেস করল রেজা।

'দুষ্ট প্রেতের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে এই ব্যবস্থা। খাইয়ে-দাইয়ে ওদের পেট ভরা রাখতে পারলে মানুষের দিকে আর নজর দেবে না।'

'কাজ হয় এতে?'

'সব সময় হয় না,' স্বীকার করল সর্দার। 'এত কিছু দেয়ার

পরেও গাঁয়ে ঢোকে। নিয়ে আসে রোগ-শোক, আমাদের গরু-ছাগল চুরি করে নিয়ে যায়। এ সব করতে করতে সাহস এতটাই বেড়ে গেছে, কিছুদিন ধরে আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও ধরে নিতে আরম্ভ করেছে। রাতের বেলা রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যায় ছেলেমেয়েগুলো। পরদিন সকালে পাহাড়, জঙ্গল আঁতিপাতি করে খুঁজেও ওদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। একবার গেলে ফেরে না আর কখনও।'

বিষণ্ন দেখাল সর্দারকে। 'আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুও এখানে বিফল হয়েছে। কি করব বুঝতে পারি না। যাই হোক, আমাদের যন্ত্রণা নিয়ে তোমাদের মন খারাপ করতে চাই না। এসো, আমাদের গাঁয়ে স্বাগতম।'

আফ্রিকার অন্যান্য গাঁয়ের চেয়ে ওগারোর গ্রাম অনেক বেশি সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। শক্ত, মোটা শ্যাওলা দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে কুঁড়েগুলোর; কাঠামো আর খুঁটি বাঁশের তৈরি। বাঁধা হয়েছে লিয়ানা লতা দিয়ে। পেপিরাসের ডাঁটি দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে—প্রাচীন মিশরীয়রা যে জিনিস দিয়ে কাগজ বানাতো, সেই একই জিনিস। তালপাতা দিয়ে তৈরি চালার চেয়ে এ চালা অনেক বেশি টেকসই। চালার নিচের দিকটা অনেকখানি করে বাড়িয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বেড়াগুলোতে বৃষ্টির পানি না লাগতে পারে।

কিন্তু ঘরবাড়ির চেয়ে গাঁয়ের মানুষের প্রতিই বেশি

কৌতূহল আর আগ্রহ রেজা-সুজার। সাত ফুটের বেশি লম্বা নারী-পুরুষ এগিয়ে এল তাদের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে। গায়ের সাদা চাদরের কারণে মার্বেলের স্তম্ভ বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। মেহমানদের ঘিরে ফেলল ওরা।

নিজের ভাষায় আগন্তুকদের পরিচয় গ্রামবাসীদের জানাল সর্দার।

ওগারোর মতই সহজ-সরল গ্রামের মানুষগুলো। হাসিমুখে মেহমানদের অভ্যর্থনা করল।

চার

একটা ব্যাপার লক্ষ করল রেজা, গাঁয়ের সব মানুষ সাত ফুট উঁচু নয়।

ওদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে অনেক খুদে খুদে মানুষ, যাদের গায়ে সাদা চাদর নেই, শুধু কোমরের কাছে একটুকরো গাছের বাকল বাঁধা। ওটাই ওদের নেংটি। উয়াটুসিদের মত তামাটে নয় এদের গায়ের রঙ, কুচকুচে কালো।

সবচেয় আজব ব্যাপারটা হলো, ওদের উচ্চতা। তিন থেকে চার ফুট, তার বেশি নয়। অথচ সবাই প্রাপ্তবয়স্ক।

'এ তো মনে হচ্ছে গালিভারের গল্পের দেশে চলে এলাম!' অবাক হয়ে বলল সুজা। 'ব্রবডিংনাগ আর লিলিপুট, দু-জাতের একসঙ্গে বসবাস। একদল দৈত্য, আরেক দল বামন। কি করে সম্ভব হলো এটা?'

'বামনরা হলো পিগমি,' রেজা বলল। 'কঙ্গোর এই এলাকার অনেক বিস্ময়ের একটা এই বিস্ময়। একই জায়গায় যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষের বাস, পাশাপাশি বাস

পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে মানুষদেরও—উয়াটুসি এবং পিগমি। উয়াটুসিদের কুঁড়ের পেছনে ওই যে ওইখানে মৌচাকের মত খুপড়িগুলো দেখছ, ওগুলো পিগমিদের বাড়িঘর।'

ওদের কথা শুনছিল সর্দার। বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। গাঁয়ের একটা অংশে পিগমিরা থাকে। ওরা আমাদের চাকর। তবে ওদেরকে অসম্মান কিংবা অপমান করার কোন কারণ নেই। ওদের সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওর নাম হিবা।'

নাম ধরে ডাকতেই বড় পুতুলের আকারের একজন মানুষ বেরিয়ে এল ভিড়ের মধ্যে থেকে। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল রেজা-সুজার সঙ্গে, অবশ্যই আফ্রিকান কায়দায়। শরীরের তুলনায় মাথাটা অস্বাভাবিক বড়। চোখের কোণে আর গলার ভাঁজ দেখেই বোঝা যায়, অনেক বয়েস তার, বুড়ো মানুষ।

উচ্চতার এই তারতম্য অদ্ভুত লাগছে রেজার কাছে।

কালো বনের কালো লোকটার চেহারার সঙ্গে মানুষের চেয়ে শিম্পাঞ্জীর মিলই বেশি। রেজাকে আরও অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে উঠল সে, 'তোমাদের সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা। তোমাদের দেশের লোকেরা কথা-বলা-ছবি তুলতে এসেছিল আমাদের দেশে। তখন তোমাদের ভাষা শিখেছি।'

'তোমাদের দেশ' বলতে আমেরিকানদের বোঝাচ্ছে সিবা। তার জানা থাকার কথা নয়, আমেরিকা থেকে এলেও রেজারা

আমেরিকান নয়, বাংলাদেশী। সে-ভুল ভাঙাতে গেলে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দিতে হবে লোকটাকে। অত কথার মধ্যে গেল না রেজা। হেসে বলল, 'আপনাদের ভাষাও যদি আমি এমন করে বলতে পারতাম, খুব ভাল হত।'

'সর্দার হিবা বলল, হাতি মারতে এসেছ তোমরা। আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

পাহাড়ের সমান হাতি মারতে সাহায্য করবে এই বানরের সমান মানুষ!—হাসি পেল রেজার। হাসল না। বলল, 'তাহলে তো উপকারই হয়। তবে একটা ভুল করছেন, হাতি মারতে নয়, ধরতে এসেছি আমরা।'

'ওই একই কথা হলো,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল হিবা। 'ধরার পরই তো মারা।' মাংস না খেয়ে জ্যান্ত হাতি কেন ধরে নিয়ে যাবে বিদেশীরা, এটা বুঝবে না সে। তাকে বোঝানোর চেষ্টাও করল না রেজা। ধরতে সাহায্য করলেই হয়। পরের কথা পরে।

রেজা কি ভাবছে, আন্দাজ করে ওগারো বলল, 'পিগমিরা অনেক বড় হাতি শিকারি। আমরা, উয়াটুসিরা কাউকে ভয় পাই না, অথচ হাতি মারার সাহস নেই। কিন্তু পিগমিদের আছে। ওরা আমাদের চেয়েও সাহসী। তাদের জাদুর আলাদা ক্ষমতা আছে। আমি এখনও জানি না, হাতি ধরতে পারবে কিনা তোমরা, কিন্তু যদি পারো, এই পিগমিদের সাহায্যেই পারবে।'

মাথা নুইয়ে সর্দারের কথায় শ্রদ্ধা জানাল কালো বামন,

বলল, 'হাতি ধরতে বিদেশীদেরকে সব রকম সাহায্য করব আমরা।'

আশ্বাস পাওয়া গেছে। একজন কুলিকে সঙ্গে দিয়ে গাঁয়ের একজন লোক পাঠিয়ে দিল ওগারো, পাহাড়ের গোড়ায় রেখে আসা রেজাদের বাকি দলটাকে খবর দেয়ার জন্যে।

চোদ্দটা ট্রাক, লরি, জীপ আর ল্যাণ্ডরোভারের সারি এসে ঢুকল গাঁয়ের পাশের খোলা জায়গায়। ক্যাম্প করার ব্যবস্থা হলো ওখানে।

উয়াটুসিদের বড় বড় শিংওয়ালা গরুগুলো ঘাস খেতে খেতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে লাগল একদল আজব মানুষকে।

তাঁবু খাটানো দেখতে এসেছে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও। তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বছর তেরো বয়েসের একটা ছেলে। গাঁয়ের রঙ উজ্জ্বল তামাটে। সুন্দর চোখ, মুখে হাসি। ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেল, কথা বলতে চায়।

ছেলেটাকে পছন্দ হয়ে গেল সুজার। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ইংরেজি জানো?'

'জানি। তবে বাবার মত বলতে পারি না।'

দ্রুত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল সুজার। জানল, ছেলেটার নাম আউরো। সর্দার ওগারোর ছেলে সে।

চমৎকার একটা হ্রদ আছে এখানে। দুপুরের পর সেটা দেখিয়ে আউরোকে জিজ্ঞেস করল সুজা, 'মাছ আছে এখানে?'

'অভাব নেই,' আউরো বলল। 'মাছ ধরতে যেতে চাও?'

রাজি হয়ে গেল সুজা।

দৌড়ে গিয়ে বাবার কুঁড়ে থেকে পেপিরাস-আঁশের সুতোয় তৈরি দুটো ছিপ নিয়ে এল আউরো। সুতোর মাথায় কোনও প্রাণীর হাড় দিয়ে বানানো দুটো বড়শি বাঁধা। বুনো শুয়োরের চোয়ালের হাড়ে তৈরি একটা বেলচা জাতীয় জিনিসও আনল।

'এটা কি জন্যে?' জানতে চাইল সুজা।

'কেঁচো তোলার জন্যে।'

এক জায়গায় ভেজা নরম মাটি খুঁড়তে শুরু করল আউরো।

'দুটো কেঁচো হলেই চলবে আমাদের,' দুটো বড়শির দিকে তাকিয়ে বলল সুজা। চন্দ্রপাহাড়ের কেঁচোর আকারের কথা ভুলে গিয়েছিল।

অবাক হলো আউরো। 'দুটো কেন?'

'দুই ছিপের জন্যে দুটো।'

'একটাই তো একশো বার গাঁথতে পারবে।'

কথাটা বুঝল না সুজা।

ইঞ্চি ছয়েক খোঁড়ার পরই আচমকা গর্তের তলার মাটি ফুঁড়ে ছিটকে বেরোল একটা বাদামী মাথা।

'সাবধান, সাপ!' ঝট করে পেছনে সরে গেল সুজা।

'সাপ না।'

মাথার পেছনে একটু নিচে যেখানে ঘাড় থাকার কথা সেখানটা চেপে ধরল আউরো। খুঁড়েই চলল মাটি, যতক্ষণ না

টেনে বের করে আনতে পারল জীবটাকে। তারপর হাত লম্বা করে তুলে ধরল।

পিগমির সমান লম্বা জীবটা, সুজার কব্জির মত মোটা। মাথাটা বাদামী, শরীরটা আগুনে-লাল। হাঁ করে রেখেছে কুৎসিত মুখ। এ ছাড়া চেহারায় আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল রেজা। দেখতে এগোল।

'চোখও নেই,' সুজা বলল, 'কানও নেই।'

'আমাদের দেশের সাধারণ কেঁচোর মতই,' রেজা বলল। 'কানে শোনে না, গন্ধ পায় না, স্বাদ বোঝে না। তবে অল্প অল্প দেখতে পায়।'

'চোখ ছাড়া কি দিয়ে দেখে?'

'ঠিক দেখে বলা যাবে না। খুদে খুদে ইন্দ্রিয় আছে এটার, এর সাহায্যে আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বোঝে। দিনের বেলা মাটির নিচে থাকে, রাতে বেরোয়। তখন টর্চের আলো গায়ে ফেললেই তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে মাটির নিচে সেঁধোবে।'

দানবীয় কেঁচোর শরীরের নিচের দিকে দু-পাশে এক ধরনের খোঁচা খোঁচা জিনিস আছে।

'এগুলো দিয়ে কি হয়?' জিজ্ঞেস করল সুজা।

'এগুলো মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে এগোতে সাহায্য করে কেঁচোকে।'

'কিন্তু সুড়ঙ্গই বা করে কি করে? খুঁড়ে ফেলা মাটি যায়

কোথায়?'

'সেটাই তো এক বিস্ময়। শরীরের ভেতর দিয়ে পার হয়ে যায় ওই মাটি। খোঁড়া মাটি গিলে ফেলে কেঁচো, সেগুলো আবার বের করে দেয় পেছনের একটা ফুটো দিয়ে। ফলে শরীরটা এগিয়ে গেলেও মাটিতে কোন সুড়ঙ্গ রয়ে যায় না, বের হওয়া মাটিতেই ভরে যায় খোঁড়া অংশটা।'

'আচ্ছা, এই কেঁচোটা পুরুষ না মেয়ে?'

'মেয়েও, পুরুষও।'

'তারমানে উভয়লিঙ্গ! বাপরে বাপ! একটা সাধারণ কেঁচোর মধ্যে এত কারিগরি!'

'এখন বুঝলি তো, কেঁচোও সাধারণ কোন প্রাণী নয়।'

হ্রদের পাড়ে একটা কলগাছের ভেলা বাঁধা আছে। সুজাকে নিয়ে সেটাতে চড়ল আউরো। বেয়ে নিয়ে এল বেশি পানিতে। মাথা কেটে ফেলে আগেই কেঁচোটাকে মেরে ফেলেছে সে। এখন সেটাকে কেটে দুই টুকরো করে বড়শিতে গাঁথল।

পানিতে বড়শি ফেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টান পড়ল সুতোয়। টেনে তুলল সুজা। ক্যাটফিশের মত একটা মাছ, তবে আরও অনেক বড়।

সুজার পর পরই আউরোও ধরে ফেলল আরেকটা।

'অবাক কাণ্ড!' সুজা বলল, 'এখানকার সব কিছুই বিশাল, কেবল পিগমিরা বাদে। তোমরা, উয়াটুসিরা দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা মানুষ। এখানকার হাতিগুলো একেকটা দানব। ফুল বড়,

গাছ বড়, এমনকি অতি সাধারণ একটা কেঁচো, তা-ও সাপের সমান। ব্যাপারটা কি?'

আউরো কিছু বলার আগেই পেছনের পর্বত থেকে ভেসে এল বিকট আওয়াজ। গাঁয়ে আসার পর এই শব্দ আরও শুনেছে ওরা, রেজা বলেছে—পর্বতের গা থেকে কয়েক লক্ষ টন বরফ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। কিন্তু উয়াটুসিদের বক্তব্য আলাদা।

আতঙ্কে গোল গোল হয়ে গেল আউরোর চোখ। 'তুমি বলছ আমরা বড়, কিন্তু আমাদের চেয়েও অনেক বড় সে!'

'সে? সে কে?'

'বজ্রমানব। সবচেয়ে লম্বা গাছটার চেয়েও লম্বা সে। হেঁটে যাওয়ার সময় মাটি কাঁপে থরথর করে। কথা বলার সময় মনে হবে হাজারখানেক সিংহ গর্জন করছে। তোমরা যাকে বিদ্যুৎ চমকানো বলো, আসলে সেটা হলো তার চোখের দৃষ্টি—রেগে গেলে অমন করেই জ্বলতে থাকে। সেই আগুন গাছে আঘাত হানলে গাছ ভেঙে পড়ে। গাঁয়ের ওপর পড়লে ঘরবাড়ি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে আসে রাতের বেলা, চুপি চুপি। প্রথমে আমাদের গরু-ছাগল নিয়ে যেত। এখন মানুষও ধরে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা নামলে আসে, ভোরের আগেই চলে যায়।'

'অতই যদি শক্তিশালী, চোরের মত আসে কেন?'

'তা বলতে পারব না।'

'আসলে সে ভীতু। নয়তো অন্যায় কিছু করে। সে-জন্যেই চুপি চুপি আসে।'

'ওরকম করে বোলো না!' ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল আউরো। 'বজ্রমানবকে চেনো না! তার বিরুদ্ধে কথা বললে তোমাদেরও ছাড়বে না। তোমাদের মারবে, তোমাদের জন্তু-জানোয়ার সব কেড়ে নেবে।'

হ্রদের একপাশে গ্রাম। অন্য পাশে পানিতে নেমে এসেছে বন। গাছের নিচে কালো ছায়া।

'অন্ধকার হয়ে আসছে,' আউরো বলল। 'বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।'

লগি বেয়ে ভেলাটাকে তীরে নিয়ে এল ওরা। মাছ দুটো এবং বাকি কেঁচোর পুরোটাই সুজাকে দিয়ে দিতে চাইল আউরো।

সুজা জিজ্ঞেস করল, 'কেঁচো দিয়ে কি করব?'

'রান্না করে খেয়ে ফেলো। খুব স্বাদ।'

'ওয়াক, থুহ্! বলে কি! কেঁচো আবার খায় নাকি! সাপ হলেও কথা ছিল। তোমরা সাপ খাও?'

'খাব না কেন? সাপের মাংস খুব ভাল, মুরগীর মাংসের চেয়ে নরম আর রসাল। কেঁচোর মাংস আরও ভাল, কারণ এগুলোর হাড় নেই।'

হাড় থাকুক আর না থাকুক, খিদেয় মরে গেলেও কেঁচো খেতে পারবে না সুজা।

'মাছগুলো আমি নিয়ে যাই,' বলল সে, 'কেঁচোটা তুমিই নাও। মাছ ধরতে নিয়ে গিয়ে অনেক মজা দিলে, ধন্যবাদ

তোমাকে। সকালে দেখা হবে।'

তাঁবুতে এসে মাছ দুটো রান্না করার জন্যে বাবুর্চির হাতে দিল সুজা। খেতে বসে বজ্রমানবের কাহিনী ভাইকে শোনাল সে।

'কেমন গাঁজা মনে হয় না?' সুজা বলল।

'হয়ও, আবার না-ও,' বলল রেজা। 'হদ্দ বোকা বলতে পারো যারা বিশ্বাস করে। তবে এটাই স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক! গাছের চেয়ে লম্বা, বজ্র নিক্ষেপ করে, গরু, মানুষ চুরি করে এমন মানুষের গল্প তুমি বিশ্বাস করো!'

'আমি না করলেও দুনিয়ার অনেকেই এ ধরনের আজগুবী গল্প বিশ্বাস করে, বিশেষ করে বনের লোকেরা। আমাদের মত তো সভ্য জগতে বাস করে না ওরা, স্কুলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না। বজ্রপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ জানে না। কুসংস্কার থাকবেই ওদের। তাই ওদের বিশ্বাস এ সব ঘটানোর মূলে থাকে দুটো শক্তি—হয় দেবতা, নয়তো শয়তান। এই গাঁয়ে গরু-ছাগল হারাচ্ছে, ছেলেমেয়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে, ভয় ওরা পাবেই। আমারই তো চিন্তা হচ্ছে।'

'তার মানে বজ্রমানবের গল্পটা তুমি বিশ্বাস করছ?'

'ওরা যে ভাবে করছে সে-ভাবে করি না। আমার ধারণা গরু-ছাগল চুরি এবং বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পেছনে মানুষের হাত আছে। আজ রাতে পাহারার ব্যবস্থা করব।

আমাদের জানোয়াগুলোও নিতে আসতে পারে। গরু-ছাগলের চেয়ে দাম অনেক বেশি ওগুলোর।'

দলের সবচেয়ে বিশ্বাসী দু-জন লোক আকামি আর মুংগাকে পাহারায় নিয়োজিত করল রেজা।

'আমি জানি তোমরা খুব ক্লান্ত,' ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল সে। 'সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রম করেছ। কিন্তু জানোয়ারগুলো চুরি হয়ে গেলে এই পরিশ্রমের কোন অর্থ থাকবে না। পালা করে পাহারা দেবে তোমরা। একজন জেগে থাকলে আরেকজন ঘুমোবে।'

রেজার কথায় প্রতিবাদ করল না ওরা।

মুংগা বলল, 'ভাববেন না বাওয়ানা। আমাদের অসুবিধে হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে জানোয়ার চুরি করতে পারবে না কেউ।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে জানোয়ারের খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল রেজা। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় খাঁচার জানোয়াগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে না। সাবধান থাকতে হবে, নিজেকে বোঝাল সে।

সুজা দাঁড়িয়ে আছে হাতির বাচ্চার খাঁচাটার সামনে। আদর করে ওটার নাম রেখেছে খুদে দানব। কিছুতেই ভেতরে থাকতে চাইছে না ওটা, শিকের ফাঁক দিয়ে শুঁড় বের করে দিয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরে টানছে, আর হাতির ভাষায় মানব-শিশুর মত আবদার করছে বের করে দেয়ার জন্যে।

হেসে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সুজা। বলল,

'রাতে আর কোথায় রাখব তোকে, বল? এখানেই আরাম। আমি তো কাছেই থাকব, তুই ডাকলেই শুনতে পাব। থাক, হ্যাঁ? লক্ষ্মী ছেলে।'

কিন্তু লক্ষ্মী হওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই খুদে দানবের। বেরোতে পারলে খুশি।

সারাদিন প্রচুর খাটাখাটনি গেছে। তাই তাঁবুতে ঢুকে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সুজা। রেজারও সময় লাগল না ঘুমাতে।

পাঁচ

ভীষণ গোলমালে চমকে ঘুম থেকে জেগে গেল ওরা। প্রচণ্ড হই-হট্টগোল!

অনেক মানুষের কণ্ঠ, মহিলাদের কান্না, বাচ্চাদের তারস্বরে চিৎকার, রেগে যাওয়া পুরুষের ধমক—সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে একদৌড়ে তাঁবুর বাইরে চলে এল সুজা। প্রথমেই খেয়াল করল, হাতির বাচ্চাটা নেই।

খাঁচার কাছে দৌড়ে এল সে। পেছনে এল রেজা।

শূন্য খাঁচা।

সারা গাঁয়ে তুমুল হই-চই। লম্বা, বেঁটে, দুই প্রজাতির মানুষেরাই ভীত পিঁপড়ের মত আতঙ্কে ইতস্তত ছোটাছুটি করছে।

শূন্য খাঁচাটার কাছে, দুই ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াল সর্দার ওগারো।

'হাতিটাকে নিয়ে গেছে,' রেজা বলল।

কথাটাকে গুরুত্বই দিল না সর্দার। আরও জরুরী দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সে।

'আমার ছেলেকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল সে। কান্নার পর্যায়ে চলে গেছে তার কণ্ঠস্বর, 'তাকে খুঁজে পাচ্ছি না! মনে হয় নিয়ে গেছে!'

আরও কয়েকজন গ্রামবাসী দৌড়ে এল দুটো গরু হারানোর খবর নিয়ে। উয়াটুসিদের কাছে মানুষের চেয়ে কম দামী নয় গরু। ভাল গরু হলে তো কথাই নেই। কিন্তু গ্রাম থেকে আসা মহিলা কণ্ঠের বিলাপ আর কান্না গরুর জন্যে নয়। কাঁদছে সর্দারের ছেলে আউরোর জন্যে, তার মা।

গাঁয়ের সর্দার, অবশ্যই সাধারণ লোকেদের মত হবে না। তার ঘরবাড়িও অন্যদের চেয়ে আলাদা। দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে তার ঘরে। গাঁয়ের একমাত্র তালা। সেই ঘর থেকে আউরোকে নিয়ে যাওয়া একটা বড় রহস্য।

'দরজায় তালা ছিল না?' জানতে চাইল রেজা।

'নিশ্চয় ছিল,' সর্দার জানাল।

'তাহলে ঢুকল কি করে লোকটা?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, ও মানুষ নয়, দুষ্ট প্রেত, স্বয়ং বজ্রমানব। আর প্রেতের জন্যে তালা কোন ব্যাপার নয়।'

'রাতে তো দু-জনকে পাহারা রেখেছিলাম,' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল সুজা। 'ওদের তো দেখছি না! কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল নাকি?'

আকামি আর মুংগাকে দেখেছে নাকি কুলিদের জিজ্ঞেস করল রেজা। না, দেখেনি ওরা।

খাঁচার আশপাশের সমস্ত ঝোপঝাড় খুঁজে দেখা হলো। এক জায়গায় ঝোপের ডাল ভাঙা, দোমড়ানো। ঘাস দলিত, মথিত। লড়াই হয়েছে যেন ওখানটাতে।

বনের অনেক ভেতরে ঢুকেও খোঁজা হলো।

ঘাবড়ে গেল রেজা, দু-জন অভিজ্ঞ লোককে হারাল না তো? আকামি আর মুংগা না থাকলে এই অভিযানই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই সময় শোনা গেল সুজার চিৎকার, 'এই যে, ওরা এখানে!'

দৌড়ে এল রেজা। একটা বড় পাথরের ফাটলে পড়ে আছে দু-জন লোক। হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। মারধোরও করা হয়েছে।

মুখের কাপড় খুলে, বাঁধন কেটে দেয়া হলো ওদের।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল রেজা।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না আকামি। 'কি আর বলব! মুংগা ঘুমাচ্ছিল, আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। চোখ বন্ধ করিনি, তবে খুব ক্লান্তি লাগছিল। কাউকে আসতে দেখলাম না, শুনলামও না কিছু, হঠাৎ কে যেন মুখ চেপে ধরল। চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। আমার মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া হলো। ঘুমের মধ্যেই মুংগার মুখেও কাপড় গুঁজে বেঁধে ফেলল। আমি

অনেক ধস্তাধস্তি করলাম, কিন্তু ছুটতে পারলাম না। আমাকেও বেঁধে ফেলল। তারপর এখানে এনে ফেলে দিয়ে চলে গেল।'

'বেশি লোক?'

'অনেক।'

'কি ধরনের মানুষ ওরা?'

'দেখিনি। তবে ওরা যে কালো মানুষ নয়, এটুকু বুঝেছি। সাদাও নয় ওরা।'

'কি যা-তা বলছ। ওদের দেখোইনি, গায়ের রঙ বুঝলে কি করে?'

'গন্ধ থেকে। ওদের গায়ে রোদ আর মাটির গন্ধ নেই কালো মানুষদের মত। সাদা মানুষের মত তামাকের গন্ধও নেই। ওদের গায়ে চা আর পুদিনার গন্ধ। ওরা নাবিক, জাহাজে করে উত্তর থেকে মোমবাসায় এসেছে।'

'আরব!' অনুমান করল রেজা। 'কিন্তু আরবরা এই পার্বত্য অঞ্চলে কি করতে এসেছে?'

আরবদের সম্পর্কে এ সব কথা বুঝতে পারছে না আউরো।

'ওরা হলো দুষ্ট প্রেত,' বলল সে। 'আর ওদের সর্দার হলো বজ্রমানব। ও এসেছিল?'

'বজ্রমানবের কথা আমি কিছু জানি না,' আকামি বলল।

'তার মাথা থাকে তারার দেশে। কথা বলার সময় গলা দিয়ে বজ্রের গর্জন বেরোয়, চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে বিদ্যুতের চমক।'

'বজ্র বা বিদ্যুৎ কোনটাই ছিল না আমাকে যখন ধরল।'

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আউরো। 'গলা বন্ধ করে রেখেছিল, চোখ করে ফেলেছিল অন্ধকার, যাতে আওয়াজও না হয়, আলোও দেখা না যায়। হলে যে আমরা জেগে যাব। কিন্তু ষাঁড়ের মত শক্তিশালী আর গাছের সমান লম্বা একজনকে তো নিশ্চয় দেখেছ?'

'অন্ধকারে ওসব কিছুই দেখিনি। তবে গায়ে মোষের জোর আছে এ কথা বলতে পারি। প্রথমে কয়েকজন চেপে ধরল আমাকে। ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলাম। তারপর দুটো হাত এসে পড়ল আমার গায়ে। পিষে ফেলতে শুরু করল। দুর্বল করতে করতে একেবারে পানি বানিয়ে দিল আমাকে। কারও হাতে এত শক্তি আর দেখিনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওগারো। 'ওই তো বজ্রমানব! আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। আর কোনদিন তাকে পাব না। কোন মানুষ লড়াই করে পারে না বজ্রমানবের সঙ্গে।'

'আমরা লড়াই করব তার সঙ্গে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল রেজা, 'এবং আমরা পারবও! আপনার ছেলেকেও ফিরিয়ে আনব, যদি সে বেঁচে থাকে। সর্দার, কিছু মনে করবেন না, আপনার ভূতের গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যে গরু চুরি করে, সে আধিভৌতিক কিছু নয়, আমার-আপনার মতই মানুষ। বাজি ধরতে পারেন আমার সঙ্গে।'

মাটি পরীক্ষা করছে সুজা।

'কি ধরতে চাও বলে ফেলো!' হঠাৎ বলে উঠল সে। 'এই পায়ের ছাপগুলো দেখো আগে। তারপর বুঝবে মানুষ কিনা!'

কাদামাটিতে বসে গেছে খালি পায়ের ছাপ, স্বাভাবিক আকারের নয় সেগুলো। আশেপাশে বড় আকারের বুটের ছাপও বসে গেছে গভীর হয়ে।

দেখে মিইয়ে গেল রেজা। একটু আগে যা বলেছে সেগুলোকে এখন বড় বড় কথা বলে মনে হতে লাগল। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হলো ভয়ের সরু একটা সুতো। আরও নিশ্চিত হয়ে গেছে, কিডন্যাপাররা অবাস্তব কিছু নয়। তবে সাধারণ মানুষও নয়। এতবড় জুতো যে পরে, সেই মানুষটা কত বড়! ওজনও নিশ্চয় অনেক। আর সেই ওজন চর্বির নয়, মাংসপেশীর। ভয়াবহ সেই শক্তির নমুনা কিছুটা পেয়েছে আকামি।

শুধু গায়ের জোরই নয়, আরও নানা রকম ক্ষমতা আছে দৈত্যটার। এতবড় শরীর নিয়ে নিঃশব্দে হাজির হয়ে যেতে পারে, আকামির মত শক্তিশালী মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে, তালা খুলতে পারে, সামান্যতম শব্দ না করে চুরি করতে পারে একটা তেরো বছরের ছেলেকে, গরু চুরি করে; সবচেয়ে বড় কথা, একটা হাতির বাচ্চাকে খেদিয়ে নিয়ে চলে গেল, কেউ টেরও পেল না। অচেনা কেউ ধরতে এলে ভীষণ চেঁচামেচি করে হাতির বাচ্চা। তার মানে এই লোকটা হাতির

ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

অস্বস্তিটা মুখের ভাবে কিংবা আচরণে প্রকাশ পেতে দিল না রেজা।

'বড় বড় বুটের ছাপ থাকায় সুবিধেই হয়েছে,' বলল সে। 'অনুসরণ করা যাবে। নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

বিশ মিনিট পর দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রেজা-সুজা। এগিয়ে চলল বুট ও হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। সঙ্গে কয়েকজন কুলি, আর অবশ্যই আকামি ও মুংগা। কয়েকজন অতি উৎসাহী গ্রামবাসীও আসতে চেয়েছিল। বাধা দিয়েছে সর্দার ওগারো।

'মরতে চাও?' হুঁশিয়ার করেছে সে। 'বজ্জমানবকে রাগিয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে মারতে চাও? এক হাতে টিপে এই গ্রামটা ভর্তা করে দিতে পারে সে। আউরো তো আমারই ছেলে, আমারও যেতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু আমি শুধু বাবাই নই, আমি এ গাঁয়ের সর্দারও, সবার ভালমন্দ দেখার ভার আমার ওপর।'

শুরুতে অনুসরণ বেশ সহজ হলো। মানুষের ছাপ যেখানে চোখে পড়ল না সেখানেও হাতির পায়ের বড় গোল গোল গভীর ছাপ পরিষ্কার দেখা গেল। দুনিয়ার আর কোন জানোয়ারই এত স্পষ্ট পায়ের ছাপ রেখে যায় না।

'একেবারেই তো সহজ,' হেসে উঠল সুজা। 'এই আরবগুলো ততটা চালাক নয়। শীঘ্রি দেখা পেয়ে যাব। তারপর

বোঝাব মজা।'

রেজা কিছু বলল না। গভীর ভাবে পরীক্ষা করছে মানুষের পায়ের ছাপগুলো। আকামিকে জিজ্ঞেস করল, 'কয়জন মানুষ মনে হয় তোমার?'

'বারো...বড়জোর পনেরো।'

'আর আমাদের তিরিশ,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল সুজা। 'ব্যাটাদের খতম করে দেয়া কোন ব্যাপারই না।'

'কিন্তু ক্যাম্পে আরও লোক থাকতে পারে,' রেজা বলল। 'কথা হলো, এত স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে, এটা কি জানে না ওরা?' নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল, 'নিশ্চয় জানে। বেশিক্ষণ আর অতটা সহজ থাকবে না। কোথাও না কোথাও কোন চালাকি খাটাবে। তোমরা সব সাবধান থাকো, চোখকান খোলা রাখো।'

সামনে বুনো ফুলের একটা বন, গাছগুলো ওদের মাথার চেয়ে উঁচু। ডালগুলো এত মোটা, ফুলগাছের বলে মনে হয় না। বিশাল মোমাবাতির মত লাগছে খাড়া হয়ে থাকা বিশ ফুট উঁচু লবেলিয়াকে। চূড়ার কাছে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়ির দিকে তাকালে মনে হয় আগুন লেগেছে ওখানে।

ফুলবন পেরোতেই বদলে গেল বনের চেহারা, শুরু হলো বাঁশঝাড়। অনেক উঁচুতে চোখা চোখা বাঁশপাতায় তৈরি চাঁদোয়াকে নীল আকাশের পটভূমিতে অনেক বেশি সবুজ লাগছে। কুয়াশার কারণে সব সময় ভিজে থাকে পাতা, ভেজা

মাটিতে ঝরে পড়ে মুক্তোর মত পানির ফোঁটা টুপটাপ, টুপটাপ। বাঁশগুলোও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক মোটা, থামের মত।

'এত বড় হতে নিশ্চয় অনেক সময় লাগে,' সুজা বলল।

'মোটেও না,' মাথা নেড়ে বলল রেজা, 'বাড়া দেখলে অবাক হবি। এক মিনিটের জন্যে এখানে মাটি শুকাতে পারে না। ফলে খেয়ে না খেয়ে বাড়তে থাকে বাঁশ। দুই মাসেই একশো ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমি বানিয়ে বলছি না।'

ভাইয়ের চোখে অবিশ্বাস দেখে হাসল সে। 'অন্য গাছ বড় হতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে বাঁশের, খুব দ্রুত বাড়ে। কিন্তু এখানে যে হারে বাড়ে, তাকে বলতে হবে তীব্র গতি, কিংবা ঝড়ের গতি।'

'এত লম্বা বাঁশের বয়েস মাত্র দুই মাস! আমি বিশ্বাস করি না।'

'না করলেও ব্যাপারটা সত্যি।'

'আর বড় হবে?'

'না, একশো ফুটই শেষ।'

'এরপর কি ঘটবে?'

'ফুল ফুটবে। মাত্র একবার। তারপর মারা যাবে। ফুল থেকে যে বীজ ঝরবে সেগুলো থেকে নতুন চারা গজাবে। ওই যে দেখ্ একটা নতুন চারা, সবে গজানো শুরু হয়েছে।'

মানুষের উরুর সমান মোটা ফুটখানেক উঁচু একটা বাঁশের

চারার দিকে তাকাল সুজা।

'কাল দিনের বেলায়ও এটা ছিল না এখানে,' রেজা বলল। 'রাতারাতি গজিয়ে গেছে।'

'কি করে জানলে?'

'পত্রিকা আর বই পড়ে। বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানো হয়েছে এদিকটায়। অনেক মাপামাপি করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম কয়েক সপ্তাহ বাঁশের চারা চব্বিশ ঘণ্টায় দুই ফুট করে বাড়ে। আস্তে আস্তে কমে আসে বাড়ার এই হার। তবে অনেক চারাই কমার সুযোগ পায় না।'

'কেন?'

'জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলে। খেতে খুব ভাল, নরম, রসাল।'

'আমি তো জানতাম শুধু মানুষে খায়. চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে পাওয়া যায় বাঁশের তরকারি।'

'উয়াটুসি আর পিগমিরাও পছন্দ করে। গরিলার তো খুব প্রিয় খাবার। দেখ্, গরিলারা ঘুরে গেছে এখান থেকে।'

ভেজা নরম মাটিতে স্পষ্ট দেখা গেল গরিলার পায়ের ছাপ। মানুষের খালি পায়ের ছাপের মতই দেখতে। তবে আকারে অনেক বড়, এর পাশে পূর্ণবয়স্ক মানুষের পায়ের ছাপকে মনে হবে শিশুর পায়ের মত।

'এত গভীর কেন?' জানতে চাইল সুজা।

'হবে না, যা ভারির ভারি। একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গরিলার

ওজন হয় সাতশো পাউণ্ড, বড় একজন মানুষের চারগুণ।'

'গেল তো এখান দিয়েই, বাঁশের এই চারাটাকে খেলো না কেন?'

'এটা গজানোর আগেই হয়তো গেছে। যত দূরে চলে যায় ততই ভাল। রোমশ ওই ভদ্রলোকদের সঙ্গে মোলাকাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।'

'কেন, ভয় পাচ্ছ?'

'না পাওয়ার কোন কারণ আছে? আদর করে যদি তোর গায়ে হাত ছোঁয়ায় তাহলেই চিত হয়ে যাবি।' চারপাশে তাকাল রেজা। 'আল্লাই জানে, কাছাকাছি আছে কিনা! দেখছে কিনা এখন আমাদের!'

'অত ভয় পাচ্ছ কেন? হামলা চালাবে নাকি?'

'গরিলার মেজাজ-মর্জির কোন ঠিকঠিকানা নেই। চালাতেও পারে।'

'বিরক্ত না করলেও মারতে আসবে? কোন জানোয়ারই নাকি বিরক্ত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না?'

'তা করে না। কিন্তু কিসে যে গরিলাকে বিরক্ত করবে, সেটা বলাই মুশকিল।'

এগিয়ে গেছে আকামি আর মুংগা। বাঁশের আড়ালে হারিয়ে গেছে। ওদেরকে ধরার জন্যে তাড়াতাড়ি এগোল দু-জনে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশে কালো মেঘ। অন্ধকার, কেমন নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ণ করে তুলেছে বনতল। ভারি, একধরনের

চাপা ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে এল হঠাৎ। ঝট করে শব্দের দিকে ফিরে তাকাল দু-জনে।

'গরিলার বাসা আছে এখানে!' নিচু স্বরে বলল রেজা।

কিন্তু বাসাটা পাওয়া গেলেও তার মধ্যে গরিলা দেখা গেল না। দুই ফুট উঁচু করে গাছের ডালপাতা আর ঘাস বিছিয়ে একটা গদিমত তৈরি করা হয়েছে। গরিলার বিছানা।

'আমি তো জানতাম গাছে থাকে ওরা,' সুজা বলল।

'গাছে চড়তে পারে, তবে রাতে ডালে থাকতে চায় না। এত ভারি শরীরের ভারে ডাল ভেঙে পড়ার ভয়ে বেশি ওপরেও উঠতে চায় না। বড়গুলো তো মাটি ছেড়ে নড়েই না।'

বিড়বিড়, ফিসফাস, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কথা বলছে যেন অনেক মানুষ। এগিয়ে আসছে ক্রমে। কিসের শব্দ, আন্দাজ করতে পারছে না সুজা। তবে শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে পেট নিয়ে ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল সে। সামনে আবছা অন্ধকারে একটা বাঁশের কোঁড় গজিয়ে থাকতে দেখল। হাতের কাছে আর কোন খাবার নেই দেখে ছুরি বের করে নিয়ে এগোল কেটে নেয়ার জন্যে। ভাবল, গরিলারা যদি খেতে পারে, সে পারবে না কেন?

ছয়

বিষণ্ণ অন্ধকারকে যেন খানখান করে দিল তীব্র, তীক্ষ্ণ চিৎকার। শিরশির করে উঠল সুজার পিঠের কাছটায়। পাঁচ ফুট দূরের যে কালো ছায়াটাকে বনের ছায়া মনে করেছিল সে, আসলে ওটা একটা গরিলা। একজন উয়াটুসি পুরুষের সমান লম্বা, কিন্তু তিন-চারগুণ চওড়া। কুচকুচে কালো শরীর, তার মধ্যে সাদা বলতে কেবল বিকট হাঁ থেকে বেরিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো। গভীর কোটরে বসা চোখের রঙও কালো। কালো নাকটাকে মনে হচ্ছে শক্ত রবারে তৈরি, আর দাড়িকে লাগছে রঙ করার ব্রাশের মত।

লম্বা একটা কালো হাত বাড়িয়ে সুজার হাত থেকে বাঁশের কোঁড়টা কেড়ে নিল গরিলা। ছুঁড়ে দিল ঝোপের ভেতর। কিঁচমিচ করে উঠল কয়েকটা কণ্ঠ। তারমানে ওখানে রয়েছে তার বাচ্চাগুলো। দুই হাতে নিজের বুকে দমাদ্দম কিল মেরে যেন ঢাক বাজাতে শুরু করল গরিলাটা। এতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঢাকের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্যে গলা ছেড়ে চিৎকার

করতে লাগল।

এই শিক্ষা জীবনে ভুলবে না সুজা। কোন বড় জানোয়ারকে বিরক্ত করার পর যে অভিজ্ঞতা হয় সেটা বলার জন্যে বেঁচে থাকে না বেশির ভাগ মানুষই। কেন যে কি কারণে বিরক্ত হবে জানোয়ারেরা, সেটাও ঠিক করে বলার উপায় নেই। এই যেমন, এই গরিলাটা হয়েছে সুজা একটা বাঁশের কোঁড় তুলেছে বলে।

দুপদাপ করে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ওর। পিছাতে শুরু করল সুজা। অতবড় এক গরিলার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে যাওয়ার মত বোকামি আর হয় না। সঙ্গে বন্দুক নেই। আছে শুধু দু-জনের কাছে দুটো ছুরি। এই দানবের বিরুদ্ধে সেগুলো দুটো সাধারণ শলা।

পিছাতে পিছাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রেজার গায়ের ওপর এসে পড়ল সুজা।

'দাঁড়িয়ে থাক,' ফিসফিস করে ভাইকে বলল রেজা। 'একচুল নড়বি না। যেই বুঝবে তুই ভয় পেয়েছিস, মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলবে মুণ্ডটা।'

পাশাপাশি দাঁড়াল দু-জনে।

সমানে ঢাক বাজিয়ে চলেছে গরিলাটা। চিৎকারও বন্ধ করছে না। আট ইঞ্চি লম্বা হাতের রোম। থাবাটা যেন একটা ভাত খাওয়ার বাসন।

'ওর ভাষাতেই ওকে শাসানো দরকার,' রেজা বলল।

নিজের বুকে চাপড় মারতে শুরু করল সে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এমন ভঙ্গি করে ফেলল, কুৎসিত, যেন সে-ও একটা গরিলা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

দেখাদেখি সুজাও তা-ই করল।

দু-জন মানুষ আর একটা গরিলার মিলিত বিচিত্র চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল বাঁশবনে। চতুর্দিকে এখানে ওখানে শুরু হয়ে গেল আরও গরিলার ঢাক বাজানো আর চিৎকার। কলরব শুরু করল পাখি আর বানরের দল।

কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে এল আকামি আর মুংগা। সঙ্গে কুলিরা। কাণ্ড দেখে তো হতবাক। একটা গরিলা চাইছে দুটো ছেলেকে ভয় দেখাতে, আর ছেলেরা চাইছে গরিলাটাকে ভয় দেখাতে।

কি করবে বুঝতে পারছে না আকামি আর মুংগা।

তবে খানিক পরে বোঝা গেল গরিলাটাই পরাজিত হতে চলেছে। কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে এক পা এগিয়ে গেল ছেলেরা। হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করছে যেন ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে গরিলাকে।

চিৎকার থামিয়ে দিল গরিলাটা। মুখের ভাব বদলে গেল। চোখে ভয় ফুটছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, লম্বা দুই হাত মাটিতে নামিয়ে দিয়ে, কব্জিতে ভর রেখে, চার হাত-পায়ে হেঁটে হারিয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুজা। ভয়টা প্রকাশ করল এতক্ষণে। বলল, 'আমার পা জমে গেছে।'

হাসল রেজা। 'তোর কিছু খাবার দরকার। বাঁশের কোঁড় খেয়ে দেখতে পারিস।'

'আরও!' ভয়ে ভয়ে গাছের নিচে ছায়ার দিকে তাকাতে লাগল সুজা, এখন তার মনে হচ্ছে প্রতিটি ছায়াই একটা করে গরিলা, 'না খেয়ে মরে যাব, তবু বাঁশের কোঁড়ের লোভ আর করছি না!'

আবার চলতে শুরু করল ওরা। বাঁশবন থেকে বেরিয়ে এল খোলা তৃণভূমিতে।

তার পরে একটা হ্রদ। বৃষ্টির মধ্যেও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।

বৃষ্টি-ভেজা আজব এই পার্বত্য অঞ্চলের এটা আরেক অদ্ভুত ব্যাপার। ঢালটা যেন বিচিত্র এক ব্যালকনি, আর প্রতিটি ব্যালকনিতে রয়েছে একটা করে হ্রদ। অভিযাত্রীরা চমৎকার সব নাম দিয়েছে এগুলোর—গ্রীন লেক, ব্ল্যাক লেক, হোয়াইট লেক, গ্রে লেক। ওপর থেকে নেমে আসা বরফগলা পানি আর ক্রমাগত বৃষ্টির পানিতে সব সময় টইটম্বুর থাকে হ্রদগুলো। প্রতিটি ব্যালকনি থেকে জলপ্রপাতের মত পানি ঝরে পড়ছে তার নিচের হ্রদটায়।

উদ্বিগ্ন হয়ে আকামি বলল, 'ওই পানিতে পায়ের ছাপ মুছে যাবে। এগোব কি করে?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। বিশাল একটা ফুলের ওপর বসে রয়েছে চন্দ্রপাহাড়ের এক ভয়াল চেহারার প্রাণী। একটা ক্যামেলিয়ন। বড় বড় চোখ, মাথা থেকে বেরিয়েছে তিনটে শিং, যেন প্রাগৈতিহাসিক দানবের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

'খুব খারাপ লক্ষণ,' আকামি বলল। 'কোথাও যাওয়ার সময় এই প্রাণী সামনে পড়লে আর এগোনো উচিত না। এগোলেই বিপদ।'

এ সব কুসংস্কার বিশ্বাস করে না রেজা, অধৈর্য হয়ে বলল, 'হলে হবে। এগোও।'

সঙ্গে আসা কুলিরাও দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ এগোতে রাজি নয়। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ছোট্ট গিরগিটিটার দিকে। আকামির সঙ্গে ওরাও একমত—ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া উচিত।

'দেখো,' বোঝানোর চেষ্টা করল রেজা, 'তোমরা সবাই সাহসী মানুষ। ভয়ানক বাঘ-সিংহের মুখোমুখি হতে পরোয়া করো না। হাতি-গণ্ডারের সঙ্গে লাগতে ভয় পাও না। দাঁত নেই, বিষ নেই এমন একটা খুদে প্রাণীকে ভয় পাচ্ছ তোমাদের মত মানুষ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?'

প্রাণীটার মুখের কাছে আঙুল নিয়ে গেল রেজা।

আতঙ্কিত চোখে নীরবে তাকিয়ে রয়েছে লোকগুলো।

নড়ল না ক্যামেলিয়নটা। কোথা থেকে উড়ে এসে একটা মাছি বসল রেজার আঙুলে। ক্যামেলিয়নের মুখ থেকে বিদ্যুতের মত ছিটকে বেরিয়ে এল লিকলিকে জিভ, মাছিটাকে

আটকে ফেলে নিয়ে চলে গেল আবার মুখের ভেতর।

'অনেকটা পিঁপড়েখেকোর মত কাজ করে এর জিভ,' সুজাকে বলল রেজা। 'কেমন লম্বা দেখলিই তো। চটচটে আঠা, লাগলে আর ছুটতে পারে না।'

মাছিটাকে খেয়ে আরেকটা ফুলের ওপর সরে গেল ক্যামেলিয়নটা। এতক্ষণ ছিল নীল ফুলের ওপর, তার শরীরের রঙও ছিল নীল; যেই কমলা রঙের অন্য ফুলটাতে গেল, শরীরটা হয়ে গেল কমলা। মুহূর্তে গায়ের রঙ বদলে ফেলেছে।

'দেখলেন!' কাঁপা গলায় বলল আকামি, 'জাদু জানে!'

'জাদু না ছাই!' রেগে গেল রেজা। 'নিজেকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই এটার, তাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রকৃতি। ভয়ঙ্কর চেহারা বানিয়েছে, যাতে অন্যেরা খেতে না আসে একে, ভয় পেয়ে সরে যায়। নিজের রঙ বদলাতে পারে, যাতে যে ফুলের ওপর বসে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। দুটো কাজ হয় এতে—শত্রুর চোখ এড়িয়ে থাকতে পারে, শিকারও তাকে দেখতে পায় না বলে জিভের নাগালে চলে আসে।'

কিন্তু কোনভাবেই বোঝানো গেল না কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলিদের।

রেগেমেগে শেষে রেজা বলল, 'বেশ, তোমরা না আসতে চাইলে চলে যাও। আমি আর সুজা একাই যেতে পারব।'

ক্যামেলিয়নটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে। পেছনে

চলল সুজা।

আধ মাইলও গিয়ে সারেনি, ছুটতে ছুটতে এল আকামি। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই তাহলে ফিরে যাবেন না?'

'না,' রেজা বলল। 'তোমার আসার দরকার নেই।'

'আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'কিন্তু অশুভ লক্ষণ যে দেখলে?'

'বিপদে পড়লে একসঙ্গেই পড়ব। আপনাদের ফেলে আমি যাব না।'

লোকটার বিশ্বস্ততায় গলে গেল রেজা। কতটা দুঃসাহস দেখাচ্ছে আন্দাজ করতে পারল। রক্তে মিশে যাওয়া শত বছরের কুসংস্কার ভাঙতে চলেছে সে, সোজা কথা নয়।

কিন্তু আকামি একাই নয়, কয়েক মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে মুংগাও এসে হাজির।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল রেজা।

হাতের রাইফেলটা দেখিয়ে কৈফিয়তের সুরে মুংগা বলল, 'ভাবলাম, এটা ফেলে যাচ্ছেন, বিপদে পড়তে পারেন। তাই নিয়ে এলাম।'

নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল রেজা।

সরে গেল মুংগা। 'না না, আপনার বয়ে নেয়া লাগবে না। আমিই নিতে পারব।'

খানিক পর এক এক করে ফিরে এল সব ক'জন। একজন লোকও ক্যাম্পে ফিরে যায়নি। ক্যামেলিয়নের ভয় কাউকে ঠেকাতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

সাত

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। অঝোরে ঝরছে এখন বড় বড় ফোঁটায়। মাথার ওপর অনেক নেমে এসেছে কালো মেঘ। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। অন্ধকারও বেড়েছে। দশ ফুট দূরের জিনিসও আর চোখে পড়ে না ঠিকমত।

কিন্তু দমল না ওরা। হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ঠিকই এগিয়ে চলল।

খুদে দানবের ছাপের পাশে মাঝেসাঝে খালি পায়ের ছোট ছাপ চোখে পড়ছে, বোধহয় সর্দারের ছেলে আউরোরই হবে।

'বেচারা আউরো!' আনমনে বলল রেজা, 'যা শুনলাম, সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েগুলোকেই কেবল নিয়ে যায়। কেন নেয়?'

'আন্দাজ করতে পারি,' আকামি বলল।

'কেন?'

'কিডন্যাপাররা স্ল্যাভার, মানুষের ব্যবসা করে। গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সুন্দর

চেহারারগুলো নেয় বেশি দাম পাবে বলে।'

কান খাড়া করে ফেলেছে সুজা। 'কিন্তু দাস ব্যবসা তো বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে বলে শুনেছি? এর বিরুদ্ধে এখন কড়া আইন করা হয়েছে।'

'কই আর হলো?' আকামির হয়ে জবাব দিল রেজা। 'আগের মত খোলাখুলি বাজারে বিক্রি হয় না, এই যা। গোপনে গোপনে এখনও হরদম চলছে এই ব্যবসা। শুধু আফ্রিকাই নয়, ভারত, বাংলাদেশ আর ওরকম দরিদ্র আরও অনেক দেশ থেকে মানুষ পাচার করে দেয়া হয় ধনী দেশগুলোতে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। নারী আর শিশুরাই প্রধানত এ সবের শিকার।'

'নিশ্চয় জাহাজে করে সাগর পার করে নিয়ে যায়। সে-জন্যেই জাহাজীদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে আকামি।'

মাথা ঝাঁকাল আকামি।

'সামনে পেলে গন্ধ শুঁকে চিনতে পারবে লোকটাকে?' জিজ্ঞেস করল সুজা।

'নিশ্চয় পারব। আরবদের ওই ডাউ জাহাজগুলোর গন্ধ বড় বদ। একবার নাকে ঢুকলে জীবনে আর ভোলার উপায় নেই।'

হ্রদের পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। সব চিহ্ন আচমকা শেষ হয়ে গেছে এখান থেকে। আকামির মত ওস্তাদ ট্র্যাকারও আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।

'ব্যাটারা ভীষণ চালাক,' বলল সে। 'এখান থেকে কোথায় গেছে বলার উপায় নেই। পানিতে নেমেছে এটুকু বুঝতে

পারছি। কিন্তু তারপর? যে কোনও দিক দিয়ে নেমে অল্প পানিতে হেঁটে গিয়ে আবার পাড়ে উঠতে পারে। সাঁতরে লেক পাড় হয়েও ওপাড়ে চলে যেতে পারে। কোনটা করেছে?'

'হাতি কি সাঁতরাতে পারে নাকি?' জানতে চাইল সুজা।

'খুব ভাল পারে,' জবাব দিল তার ভাই। 'তবে পানি বেশি গভীর না হলে সাঁতরানোর চেয়ে তলা দিয়ে হেঁটে চলে যেতেই বেশি পছন্দ করে ওরা।'

'তাজ্জব ব্যাপার! শ্বাস নেয় কি করে?'

'শুঁড়টা উঁচু করে রাখে, নাকের ফুটো বের করে রাখে পানির ওপর।'

'তাহলে তো পানির নিচে কাদায় পায়ের ছাপ থাকার কথা।'

হ্রদটা বেশি গভীর না। টলটলে পরিষ্কার পানিতে চোখ ডুবিয়ে নিচের কাদা দেখতে লাগল আকামি। কিছুই দেখতে পেল না। একটা পরীক্ষা করল তখন। নেমে গেল পানিতে। পা দেবে গেল কাদায়। নাড়া লেগে ঘোলা হয়ে গেল পানি। ওপরে উঠে এল সে। আবার পানিতে চোখ ডুবিয়ে দেখল। আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল কাদা, আবার পরিষ্কার হলো পানি। তার পায়ের ছাপ নেই।

তারমানে হাতি এদিক দিয়ে গেলেও বোঝার উপায় নেই, চারপাশ থেকে গলিত কাদা সরে এসে নিমেষে ঢেকে দিয়েছে তার পায়ের ছাপ।

'কোনখান দিয়ে তো নিশ্চয় উঠেছে পানি থেকে,' সুজা বলল। 'পাড়ে নিশ্চয় ছাপ পড়েছে। সেটা খুঁজে বের করলেই তো পারি?'

কিন্তু বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না আকামি। কারণ অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। পায়ের ছাপ পড়লে সেটা মুছে দেবে এই বৃষ্টি। তবু রেজার কথার প্রতিবাদ না করে হ্রদের পাড়ে খুঁজতে শুরু করল সে।

সাংঘাতিক বিরক্তিকর এই শীতল বৃষ্টি। বেশিক্ষণ এর মধ্যে থাকলে একধরনের অস্থিরতায় পেয়ে বসে মানুষকে। কুলিদের মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করল।

হ্রদের পশ্চিম পাড়ে এসে আরেক বিপদ, চলাই মুশকিল হয়ে উঠল। থিকথিকে কালো কাদা, পা পড়লে দেবে যায়—কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত দাবে। কি মনে হতে ম্যাপ বের করল রেজা। দেখল, এখানেই আছে সেই কুখ্যাত বিগো বগ, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করেছে অভিযাত্রীরা। পানি আর কাদার আঠাল সূপ তৈরি হয়ে থাকে যেন এখানে। মানুষের পা আঁকড়ে ধরে রাখে। এর মধ্যে হাঁটতে গেলে সাংঘাতিক পরিশ্রম।

শরীর দেবে গেলেও এটাকে চোরাকাদা বলা যাবে না। কারণ চোরাকাদাকে যেমন 'অতল' বলা হয়, এটা ঠিক সে-রকম নয়। তবে চোরাকাদার চেয়ে কম বিপজ্জনকও নয়। যেখানে বেশি গভীর, সেখানে পড়লে অন্যের সাহায্য ছাড়া

উঠে আসা কঠিন।

কাদার মধ্যে নেমে এগোনোর চেষ্টা করতে হঠাৎ কোমর পর্যন্ত দেবে গেল আকামির। সবাই মিলে টেনেটুনে তাকে তুলে আনল বগ থেকে।

হেঁটে যেতে পারবে না বুঝে সাঁতরে যাওয়ার চেষ্টা করল সুজা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত করে পড়ল তরল কাদার ওপর। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার শরীর।

তাড়াতাড়ি কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার বাহু ধরে টেনে তুলে আনল রেজা আর আকামি।

সারা গায়ে কাদা মেখে ভূত সেজে গেছে সুজা। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, 'বাপরে বাপ, কি জঘন্য! পানি আর কাদা যে এক জিনিস নয় এতদিনে বুঝলাম! সাঁতার কাটা অসম্ভব!'

এই সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওদের। দুটো হাতি। একটা বড় মাদী, আরেকটা ছোট মদ্দা—বয়েস খুব অল্প, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। কিন্তু হাতির বাচ্চা তো, বয়েস কম হলেও গায়ে-গতরে অনেক বেড়ে গেছে। বড়টা সম্ভবত ছোটটার মা।

কাদায় পড়েছে বড়টা। পাড়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে তাকে টেনে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাচ্চাটা।

অনেক চেষ্টা করেও মাকে তুলতে পারল না সে। মায়ের তুলনায় অনেক ছোট, গায়ে শক্তিও কম, অতবড় ভারি একটা শরীরকে কি আর তুলে আনতে পারে? আর্ত চিৎকার করতে

করতে কাদায় পুরোপুরি ডুবে গেল মা। বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করল বাচ্চাটা, কাদার পাড়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। অনেকটা মা-হারা মানবশিশুর মতই।

বড় মায়া লাগল সুজার। কিন্তু কি করবে? বিশাল একটা হাতিকে কাদা থেকে তুলে আনার সাধ্য তাদের নেই।

এই করুণ দৃশ্য মন খারাপ করে দিল অভিযাত্রীদের। কাদার ভয়াবহতাও বুঝতে পারল। এই কাদা মাড়িয়ে আর এগোনোর সাহস করল না।

তা ছাড়া পায়ের ছাপ নেই, কোন চিহ্ন নেই, কোন দিকে এগোবে? অহেতুক আর হাঁটাহাঁটি না করে নিরাশ হয়ে গাঁয়ে ফিরে চলল দলটা।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল এই সময় হাতির বাচ্চাটা। একাকী এই ভয়ঙ্কর জায়গায় থাকতে যেন সাহস হলো না তার, মানুষের পিছে পিছে চলল।

হাতি বাচ্চারা এ রকম করে, জানা আছে সুজার। নিরালা জায়গায় একলা থাকতে ভয় পায়। কি মনে হতে হাত বাড়িয়ে ডাকল ওটাকে সে। কুকুরের বাচ্চার মতই সাড়া দিল হাতির বাচ্চা। এগিয়ে এসে তার হাতে শুঁড় ঘষতে লাগল।

আদর করে তার শুঁড়ে হাত ঘষে দিল সুজা। সহজেই জন্তু-জানোয়ার নেওটা হয়ে যায় তার। এই বাচ্চাটারও হতে দেরি লাগল না। নামও একটা দিয়ে দেয়া হলো। মায়ের কাদায় ডুবে মরার ঘটনাটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বাচ্চার নামকরণ হলো 'কাদার খোকা'।

আট

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল সর্দার ওগারো, ওদের দেখেই দৌড়ে এল। ভেজা চুপচুপে, কাদা মাখা বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে দেখেই অনুমান করে নিল কি ঘটেছে। তবু জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছেলেকে পেয়েছ?'

নীরবে মাথা নাড়ল রেজা।

বিষণ্ণ চোখ তুলে পর্বতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল সর্দার, 'হে বজ্রমানব, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষের কিছু করার নেই! বুঝলাম, আর কোনদিন ছেলেকে দেখতে পাব না আমি!'

'দেখুন, এত সহজে হাল ছাড়বেন না,' বোঝাতে চাইল রেজা, 'আমরা এখনও চেষ্টা ছাড়িনি। খবরটা পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'লোক পাঠিয়েছি একজন। কিন্তু জানি, লাভ হবে না। এমনিতেই অনেক কাজ পুলিশের, গোলমাল লেগেই আছে দেশে, ছেলে হারানোর মত একটা ছোট্ট ঘটনাকে পাত্তাই

দেবে না ওরা। আসবে না।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কুঁড়েতে ফিরে গেল সর্দার।

শরীর থেকে আঠাল কাদা ধুয়ে ফেলার জন্যে হ্রদে নামল রেজা-সুজা আর তাদের সঙ্গীরা।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ক্যাম্পে যারা ছিল, তারা রান্না করেই রেখেছে। তাঁবুতে ঢুকেই খেতে বসে গেল রেজারা। গপগপ করে গিলতে লাগল সবাই। কাদার খোকারও খাবারের ব্যবস্থা করল কুলিরা।

পেট শান্ত হয়ে এলে সুজা জিজ্ঞেস করল তার ভাইকে, 'আজ রাতে কি করব? পাহারা লাগবে? হাতির এই বাচ্চাটাকেও যদি চুরি করতে আসে?'

'খাঁচায় তালা দিয়ে রাখব,' জবাব দিল রেজা।

খাঁচায় ঢুকতে চাইল না হাতির বাচ্চা। শেষে সুজাকে আগে ঢুকে ডেকে ডেকে তাকে ঢোকাতে হলো। তারপর এক ফাঁকে পিছলে বেরিয়ে চলে এল সে। চট করে তখন দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দেয়া হলো। শিকের ফাঁক দিয়ে শুঁড় বের করে হাতির ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে লাগল কাদার খোকা। আদর করে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল সুজা, 'থাক, কোন ভয় নেই। এখানেই তুই বেশি নিরাপদ।'

বলল বটে, কেন যেন কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। আগের রাতে খুদে দানবকেও এ রকম অভয় দিয়েছিল।

কিন্তু রক্ষা করতে পারল কই?

তবে এদিন আর ভুল করল না। এক তালার ওপর ভারি আরেকটা তালা লাগাল সে। 'দেখি, এবার কি করে খোলে ব্যাটারা?'

ঝুঁকি নিতে চাইল না রেজা, পাহারার ব্যবস্থা করল। হাতির বাচ্চাটা ছাড়াও আরও অনেক দামী দামী জানোয়ার আছে। নিলে ভাল দামে বেচতে পারবে ডাকাতরা।

আকামি আর মুংগা বেজায় ক্লান্ত। কুলিদের কারও ওপর পাহারার ভার দিতে ভরসা পেল না রেজা। সর্দার ওগারোর সঙ্গে পরামর্শ করল।

গ্রাম থেকে লোক দিল সর্দার।

হাতে বল্লম নিয়ে খাঁচার সামনে পাহারায় বসল দু-জন শক্তিশালী উয়াটুসি যোদ্ধা।

আহত হাতির চিৎকারের মত অদ্ভুত শব্দ পৃথিবীতে আর আছে বলে জানা নেই সুজার। চমকে জেগে গেল সে। মেরুদণ্ডে বয়ে গেল শীতল শিহরণ, শিরশির করে উঠল চামড়া, খাড়া হয়ে গেল রোম। মনে হলো বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে ফেলেছে।

একটা মুহূর্ত যেন পাথর হয়ে পড়ে রইল সে। তারপর বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিল তাঁবুর বাইরে, কি হয়েছে দেখার জন্যে।

খাঁচার কাছে এসে হোঁচট খেল। কিসে লাগল দেখার জন্যে

তাকাল নিচে। অন্ধকার এখনও কাটেনি। আবছা ভাবে দেখল ওগারোর একজন প্রহরী পড়ে আছে। নিথর। তাড়াতাড়ি বসে তার নাড়ি দেখল। মারা গেছে লোকটা।

হাতড়ে হাতড়ে দ্বিতীয় লোকটাকেও বের করল সে। সে-ও মৃত।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেজা। তাঁবু থেকে বেরোতে শুরু করেছে কুলিরা। গাঁ থেকে আসছে গ্রামবাসীরা। খাঁচার মধ্যে এখনও চিৎকার করে চলেছে হাতির বাচ্চাটা।

'কি হয়েছে ওর?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রেজা।

'মনে হয় ডাকাতেরা ভয় দেখিয়েছে।'

তালায় হাত দিয়ে দেখল সুজা। একটা খোলা। আরেকটা লাগানো রয়েছে।

দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে চাবি নিয়ে এল সে। তালা খুলল।

'কি করবি?'

'ভেতরে গিয়ে ওকে শান্ত করব।'

'যাসনে! এখন ওর হুঁশ নেই, খুন করে ফেলবে!'

'করবে না। আমাকে চেনে।'

দরজা খুলে আস্তে ঢুকে পড়ল সুজা।

'এই, খোকা, চুপ কর! আমি, চিনতে পারছিস না? আমি...'

কিন্তু তার কথা হাতির কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। নিজের চিৎকারেই হয়তো কান ঝালাপালা, সুজার কথা আর

শুনতে পাচ্ছে না। এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সুজা। খাঁচার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

চেপে ধরল তাকে বাচ্চাটা। বাচ্চা হলেও হাতির বাচ্চা, মানুষের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। চাপ দিতে শুরু করল। আরেকটু বাড়লেই মড়মড় করে পাঁজর ভেঙে যাবে সুজার। বুঝল, রেজা ঠিকই বলেছে। ঢোকাটা উচিত হয়নি।

শুঁড়টা ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল সে। ওটাতে হাত বুলিয়ে দিতে পারলে হয়তো শান্ত করা যাবে।

একটা কান ঠেকল হাতে। একটা দাঁত। হাত চলে গেল যেখানে শুঁড় থাকার কথা, কিন্তু নেই ওটা। তার বদলে চটচটে আঠাল পদার্থ ভিজিয়ে দিল হাত।

আরেকটু ওপর দিকে হাত তুলতে হাতে ঠেকল কাটা মাংস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আরও ওপরে কাটা শুঁড়ের গোড়াটুকু।

ব্যাপারটা বুঝে ফেলল সুজা। চুরি করতে এসে দু-জন প্রহরীকে খুন করেছে ডাকাতেরা। হাতিটাকে চুরি করতে চেয়েছে। কিন্তু তালা খুলতে পারেনি। বাচ্চাটা ভেবেছিল, কোন বন্ধু এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শুঁড় বাড়িয়ে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল সে। কেটে ফেলেছে ভয়ানক নিষ্ঠুর লোকটা। নিশ্চয় ভেবেছে—নিতেই যখন পারলাম না, অন্য কাউকেও রাখতে দেব না। শুঁড় কাটা হাতির কোন দাম নেই।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছে বাচ্চাটা। শান্ত করার আশা

বৃথা। খাঁচায় থাকলে মরতে হবে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল রেজা।

এই খেপা অবস্থায় শুঁড় থাকলে কিছুতেই বেরোতে পারত না সুজা, ধরে ফেলত তাকে হাতি। এখন ধরতে পারল না বটে, মাথা দিয়ে ঢুস মারতে ছাড়ল না।

খাঁচার বাইরে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল সুজা।

তাড়াতাড়ি এসে তাকে তুলে নিল কয়েকজন কুলি।

খাঁচা থেকে ছুটে বেরোল ক্ষিপ্ত হাতি। যাকে সামনে পেল তাকেই ধরার চেষ্টা করতে লাগল। এদিক ওদিক ছুটে পালাতে শুরু করল লোকে।

কাউকে ধরতে না পেরে গাঁয়ের দিকে ছুটল মত্ত হাতি। প্যাপিরাসের তৈরি কুঁড়ের বেড়াগুলোকে ফড়ফড় করে টেনে ছিঁড়তে লাগল। তছনছ করে ফেলতে লাগল সব কিছু।

আচমকা কানফাটা শব্দে গর্জে উঠল ভারি রাইফেল।

ঢলে পড়ল হাতিটা।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন। সেই আবছা আলোয় রেজার হাতে রাইফেলটা দেখতে পেল সুজা।

'কেন মারলে?' চিৎকার করে উঠল সে।

'আর কি করতে পারতাম!'

'কয়েক মিনিট সময় পেলে শান্ত করতে পারতাম ওকে। মেরে ফেলার দরকার ছিল না।'

'পারতি না। ওর শুঁড়ের যন্ত্রণা কমত না। ক্রমেই আরও

ক্ষিপ্ত হত। রক্তক্ষরণে মরার আগে আরও কি কি ক্ষতি করত কে জানে। মানুষ মারলেও অবাক হতাম না।'

'কিন্তু ওষুধ আছে আমাদের কাছে। ওর চিকিৎসা করতে পারতাম।'

'দেখ্, সুজা, মাঝে মাঝে তুই বোকা হয়ে যাস! তোর দুঃখ বুঝতে পারছি। একটা কথা বুঝছিস না, জখমটা সারানো গেলেও কোনদিনই আর শুঁড় ফিরে পেত না সে। বেঁচে থাকতে সাংঘাতিক অসুবিধে হতো। তোর দুটো হাত কেটে দিলে কি অবস্থা হবে বল? হাতির শুঁড় না থাকলে তার চেয়েও অসুবিধে হয়। পানি খেতে পারত না। ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার আর কোন উপায় ছিল না।'

ছুরি আর কুড়াল নিয়ে মৃতদেহটার ওপর ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। হাতির মাংস তাদের প্রিয় খাবার। নষ্ট করার মানে হয় না।

রেজার কথায় তখনকার মত চুপ হয়ে গেলেও রাগ চাপা আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল সুজার মনে। ডাকাতদের ওপর বিষিয়ে গেছে মন। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন একটা প্রতিজ্ঞা করল সে। তাকাল ভাইয়ের দিকে।

বুঝতে পারল রেজা। নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু।

নয়

নাস্তার পর ঘটনাটা নিয়ে আকামির সঙ্গে আলোচনায় বসল রেজা।

'সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে কেউ, ভাবা যায় না!' বলল সে। 'কাল রাতে আবার নিশ্চয় পায়ের ছাপ রেখে গেছে। কি মনে হয় তোমার, পিছু নিয়ে ধরা যাবে?'

মাথা নাড়ল আকামি। 'না, লাভ নেই। কালকের অবস্থাই হবে। পানির কাছে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের, তারপর ফুস্!'

'যদি খালি জানতাম কোথায় থাকে ব্যাটারা! এতবড় পার্বত্য এলাকায় কোথায় খুঁজব ওদের?'

'হাঁটাচলাও সহজ নয় এখানে,' সুজা বলল। 'রাস্তা তো নেইই, দুনিয়ার যত কাদা, হ্রদ, জঙ্গল, খাড়া খাড়া টিলা আর তুষার।'

'তারপরেও, হাল আমরা ছেড়ে দিতে পারি না,' রেজা বলল। 'আকামি, সবাইকে বলো তৈরি হতে। একঘণ্টার মধ্যেই বেরোব আমরা।'

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল সুজা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল। বন থেকে বেরোতে দেখেছে খুদে দানবকে।

মাথা বের করেই দাঁড়িয়ে গেছে হাতির বাচ্চাটা। সাবধানে তাকাচ্ছে। সুজাকে দেখে চিৎকার করে উঠল আনন্দে। ছুটে এল তার দিকে।

সুজাও ছুটে গেল। 'কোথায় ছিলি তুই খুদে! জলদি বল! কেমন আছিস?'

ম্যাজিকের মত চারপাশে লোক জড় হয়ে গেল। সুজার দুঃখ দেখে মন খারাপ হয়ে ছিল ওদেরও, আনন্দ দেখে খুশি হলো।

সবাই খুশি, কেবল সর্দার ওগারো বাদে।

'আমার ছেলে? আমার ছেলে তো এল না ওর সঙ্গে!'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল বনের দিকে। আউরোকে দেখা গেল না। ডাকাতদের আখড়া থেকে পালিয়ে এসেছে একলা খুদে দানব। কাদায় মাখামাখি। তাকে হ্রদে গোসল করাতে নিয়ে গেল সুজা।

ভাল করে গোসল করিয়ে তাকে নিয়ে পানি থেকে উঠে এল সে। খেতে দিল।

অনেক অত্যাচার চলেছে বেচারার ওপর। চামড়ায় আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ। কাঁটা বসানো ভারি বুটের লাথি আর চামড়ার চাবুকের বাড়ির সাক্ষর ওগুলো।

ভীষণ রাগ লাগছে সুজার। শাস্তি দিতেই হবে শয়তান-

গুলোকে। আউরোকেও উদ্ধার করে আনতে হবে। কিন্তু ওদের আস্তানাটা খুঁজে পাবে কি করে? পায়ের ছাপ ধরে গিয়ে যে লাভ নেই, সে তো জানাই হয়ে গেছে।

চট করে মাথায় এল বুদ্ধিটা। তাই তো, খুদে দানবের পায়ের ছাপ ধরে ধরে গেলেই হয়! কাছেই আকামিকে দেখে উত্তেজিত হয়ে তাকে কথাটা জানাল সুজা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আকামি।

'হতে পারে, কাজ হতে পারে!'

সুতরাং আবার দল বেঁধে বেরোনোর পালা। আগের রাতে ডাকাতেরা যে ছাপ রেখে গেছে, সেগুলোকে গুরুত্ব দিল না ওরা, বাচ্চা হাতিটার ছাপ অনুসরণ করে এগোল। অনেক জায়গায় ছাপ অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু আকামির অভিজ্ঞ চোখে তা-ও এড়াল না।

গ্রীন লেকের দিকে এগিয়ে গেছে চিহ্ন। তবে এবার আর পানিতে হারিয়ে গেল না। বরং হ্রদের পাড় ধরে এগোল। ডানে ঘুরে পুব দিকে চলে গেছে। পুব প্রান্ত ছাড়িয়ে, জলপ্রপাত পেরিয়ে প্রায় খাড়া পথ বেয়ে উঠে গেছে ব্যালকনিতে, যেখানে ব্ল্যাক লেককে ঢেকে রেখেছে কালো মেঘ। এখানে জন্মে আছে দানবীয় পাম, দানবীয় মিমোসা আর আট ফুট উঁচু ঘাস। বিশাল এক গণ্ডার চরছে দানবীয় বিছুটি বনে, তিন ইঞ্চি লম্বা কাঁটাওয়ালা ডালগুলো চিবিয়ে চলেছে—ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আইসক্রীম কেক খাচ্ছে। হ্রদের কিনারে জন্মে আছে বড় বড়

জলজ উদ্ভিদ।

পুরো দৃশ্যটা এতটাই অস্বাভাবিক, সুজার মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে। বিড়বিড় করে বলল, 'এ তো ফ্যান্টাসি ল্যাণ্ড! কল্পনার রঙিন জগৎ!'

'মোটেও কল্পনার জগৎ নয়, বাস্তব, অতিমাত্রায় বাস্তব,' রেজা বলল। 'তিরিশ লক্ষ বছর আগে পুরো আফ্রিকারই এই চেহারা ছিল। এখান থেকে বেশি দূরে নয় সেরেঙ্গেটি প্লেন—বিশাল এক তৃণপ্রান্তর, ওখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে অতিকায় শুয়োর, ভেড়া, উটপাখি, বেবুন আর গণ্ডারের ফসিল। আজকের গণ্ডারের দুই গুণ বড় ছিল ওগুলো। আফ্রিকা ছিল দানবের রাজত্ব। দানবেরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেবল এই পার্বত্য এলাকা বাদে। এখানে ওরা টিকে আছে আজও।'

'কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না আমার, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দানবেরা, অথচ এখানে টিকে থাকল কি করে?'

'এর সঠিক জবাব কেউ দিতে পারে না। প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়াটা অবশ্য একটা বড় কারণ। তাতে দ্রুত বাড়ে গাছপালা, বড় হয়; আর বেশি খাবার পেলে তৃণভোজীরাও বিশালাকার হয়ে যায়। কিন্তু অনেক কারণের একটা হতে পারে এটা, সব নয়। আরেকটা জবাব হতে পারে এই জায়গাটা কোনভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল দুনিয়ার সঙ্গে, এখনও আলাদা হয়েই আছে, সাগরের মাঝে দ্বীপগুলো যেমন মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা

হয়ে যায়। মাটিরও কোন ব্যাপার থাকতে পারে। এই অঞ্চলে কখনও আগ্নেয়গিরির উৎপাত হয়নি, ফলে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এক রকম রয়ে গেছে মাটি। যা-ই ঘটে থাকুক, এখানে আমরা তিরিশ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর পরিবেশে রয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেমন লাগছে ভাবতে?'

'ভূতুড়ে!'

ভারি কুয়াশা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে রূপ নিল। বাড়তে বাড়তে একেবারে মুষলধারে শুরু হলো, সেই সঙ্গে বজ্রপাত। দশ মিনিটে মুছে দিল বাচ্চা হাতিটার পায়ের ছাপ।

হঠাৎ করে থেমে গেল বৃষ্টি। পায়ের ছাপের জন্যে ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি চলল। মেঘের নিচে ঢেকে থাকা অদৃশ্য পর্বতের দিক থেকে ভেসে এল বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল যেন ব্যঙ্গ হাসি হেসে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সবাইকে ছড়িয়ে পড়ে একশো ফুট গোল একটা বৃত্ত তৈরি করার নির্দেশ দিল আকামি। তারপর ভাল করে প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা পরীক্ষা করে দেখতে বলল। দেখতে দেখতে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসবে সবাই।

কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। ভেজা মাটিতে বসে পড়ল ওরা।

আবার বাজের হাসি শোনা গেল গুপ্ত পর্বত থেকে।

এই শব্দ রাগিয়ে দিল রেজাকে। 'এখানে বসে বসে ওই

হাসি শুনবে নাকি? তোমরা পুরুষ মানুষ, না কচি খোকা? দুদু খাও? যাদের ভয়ে কাবু হয়ে বসে আছ এখানে, তারা দেবতা নয়, আমাদেরই মত মানুষ। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আশেপাশেই কোথাও আছে ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। ওদের খুঁজে বের আমাদের করতেই হবে। এক কাজ করি এসো, ভাগাভাগি হয়ে খুঁজতে থাকি। একসঙ্গে দু-জন দু-জন করে থাকব। এই জায়গা থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ব আমরা। তন্নতন্ন করে খুঁজব। দুপুর নাগাদ ফিরে আসব আমরা এই জায়গায়, কেউ কিছু পেয়ে থাকলে বলব।'

কেউ আনমনে মাথা নাড়ল, কেউ বিড়বিড় করল, কিন্তু নির্দেশ অমান্য করল না কেউ। কে কার সঙ্গে থাকবে, ভাগ করে দিল আকামি। একেক দল একেক দিকে ছড়িয়ে গেল। রেজা-সুজা রওনা হলো উত্তরে।

খাড়া আরেকটা ঢালের কাছে চলে এল ওরা। দানবীয় গাছপালা এখানেও, রোমশ ডালপালা; বিরাট বিরাট ফুল—যেমন ডেইজির আকারই বাসনের সমান। যে সব শ্যাওলা পায়ের নিচে কার্পেটের মত হয়ে থাকার কথা, সেগুলো রেজার মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল দু-জনে। সামনে অসম্ভব ঘন হয়ে জন্মেছে শ্যাওলা, লতার সঙ্গে জট পাকিয়ে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একেবারে নিরেট, কোন ফাঁক-ফোকর নেই এর মধ্যে।

'হবে না এ ভাবে,' মাথা নেড়ে বলল রেজা। 'শ্যাওলা

ঠেলে এগোনো যাবে না। এমন কাণ্ড আর দেখিনি!'

'জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করে কি ভাবে তাহলে?'

'ভাল প্রশ্ন। নিশ্চয় সুড়ঙ্গ আছে। করে নিয়েছে ওরা। চল, বেরিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখি।'

যতটা কষ্ট করে ঢুকেছে, ঠিক ততটাই কষ্ট করে শ্যাওলা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে আবার বেরিয়ে এল ওরা। শ্যাওলার কিনার ধরে এগোল। খুঁজে বের করল সুড়ঙ্গমুখটা। কিন্তু বড় বেশি সরু ওটা—সাপ কিংবা ইঁদুর-ছুঁচো জাতীয় প্রাণীরা তৈরি করেছে। কিন্তু চন্দ্রপাহাড়ের ইঁদুর-ছুঁচোও বেড়ালের চেয়ে বড়।

সুজা বলল, 'মোড়ামুড়ি করে ঢুকে যাওয়া যায়।'

'তা যায়। গিয়ে সাপের কামড় খেয়ে মরাও যায়। ইঁদুর চলাচল করলে এখানে সাপ থাকতে বাধ্য। মামবা কিংবা গোখরোর মুখোমুখি পড়লে আর বাঁচতে হবে না। অন্য কিছু করা দরকার।'

কি করবে ভাবছে ওরা, এই সময় সমস্যার সমাধান করে দিল একটা শুয়োর। ছুটে বেরোল আরেকটা বড় সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে। এতক্ষণ ওই মুখটা চোখে পড়েনি ওদের।

মানুষ দেখে থমকে দাঁড়াল শুয়োরটা। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শুরু করল। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে গোলমাল না করে ছাড়বে না।

ছুরির মত ধারাল ভয়ঙ্কর দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রেজা। ভাইকে সাবধান করল, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক!'

চোখ গরম করে গোঁ-গোঁ করে ধমক দিল শুয়োরটা, কয়েকবার আক্রমণ করার মিথ্যে হুমকি দিল। কিন্তু 'বোকা মানুষগুলো' তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না দেখে বোধহয় ভাবল, এই কাপুরুষদের সঙ্গে লড়াই করে মজা নেই। শেষবারের মত একবার শাসিয়ে, দাঁত নাচিয়ে, নেমে চলে গেল পর্বতের ঢাল বেয়ে।

দশ

সুড়ঙ্গটার ভেতরে উঁকি দিল ওরা। তিন ফুট উঁচু, দুই ফুট মত চওড়া। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ভেতরটা মোটেও পছন্দ হলো না সুজার। 'হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোতে হবে। ভেতরে ঢুকে আরেকটা শুয়োরের যদি মুখোমুখি হয়ে যাই? যা অন্ধকারের অন্ধকার, বাপরে বাপ! সাংঘাতিক বিপদে পড়ব!'

'অন্য ভাবেও ভেবে দেখতে পারিস। তোর যেমন অপছন্দ, শুয়োরেরও তেমনি অপছন্দ হতে পারে এই সুড়ঙ্গ। চিতাবাঘের ভয়। সুতরাং সামনে যদি শুয়োর পড়ে, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করেই, তুইও চেঁচানো শুরু করবি। চিতাবাঘের মত গর্জন করতে পারলে তো আরও ভাল। চিতাবাঘ সাজার এই মোক্ষম সুযোগ ছাড়া বোধহয় উচিত হবে না। কি বলিস?'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু গর্জনের ওপর ভরসা করতে পারব না আমি। ছুরিটা হাতে রাখব। চিৎকার শুনে ভয় না পেলে শেষ ভরসা এই ছুরি।'

'হাতে নয়, দাঁতে,' শুধরে দিল রেজা। 'হামাগুড়ি দেয়ার জন্যে হাত দুটো ব্যবহার করতে হবে তোকে। ছুরি ধরতে পারবি না।'

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে, দাঁতে ছুরি কামড়ে ধরার পর শুয়োরের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর মনে হলো না দুই ভাইকে।

আগে সুড়ঙ্গে ঢুকল রেজা। সামনে কোন বিপদ থাকলে প্রথমে সে-ই সেটার মোকাবেলা করতে চায়।

এতে সুজা যে বিপদমুক্ত থাকল তা নয়, কারণ আক্রমণ পেছন থেকেও আসতে পারে।

তাতে বরং বিপদটা বেশিই, পেছন দিকে ছুরি চালাতে পারবে না। এত সরু সুড়ঙ্গে ঘোরার উপায় নেই।

ভাইকে সামনে থাকতে দেয়ায় শুরুতে যে অস্বস্তিটা ছিল, এখন আর নেই। বিপদে পড়লে রেজা তো অন্তত ছুরি চালাতে পারবে, সে তা-ও পারবে না। তার সামনের দিকটায় একটা বাধা অন্তত আছে, পেছনে কিছুই নেই। একেবারে খোলা। শুয়োর এসে যদি দাঁত দিয়ে চিরে দেয়, কিংবা চিতাবাঘে কামড়ে ধরে, কিছুই করার থাকবে না তার।

'চল, এগোই.' রেজা বলল। 'কোন অসুবিধে আছে?'

'না,' মানা করে দিল সুজা। বিপদটা বুঝতে যখন পারেনি তার ভাই, না বুঝুক, স্বস্তিতে থাকুক।

চলতে চলতে নতুন আরেকটা দুশ্চিন্তা এসে ভর করল মাথায়—কত লম্বা এই সুড়ঙ্গ? কয়েক মাইলও হতে পারে। এ

ভাবে হামা দিয়ে কতটা এগোনো সম্ভব? বিপদ আরও আছে। মাটিতে পড়ে থাকা কুটো আর চোখা পাথর ইতিমধ্যেই হাতের তালু আর হাঁটুতে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। এই অত্যাচার কতক্ষণ সইতে পারবে?

সামনে থেকে ডাকল রেজা, 'সুজা, আসছিস?'

অনেকটা এগিয়ে গেছে সে। শ্যাওলার সুড়ঙ্গের ভেতর প্রতিধ্বনি তেমন হলো না, শব্দটাও কেমন চাপা চাপা।

চিৎকার করে জবাব দিল সুজা।

কয়েক মিনিট নীরবে হামাগুড়ি দিল সে। হঠাৎ শ্যাওলায় বাড়ি খেল মাথা। থেমে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কি? দু-ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

এবার কি? কোনটা ধরে যাবে?

ডাকল, 'ভাই? রেজা?'

মনে হলো, তার মুখ ভর্তি তুলো। বিস্ময়কর ভাবে শব্দ চেপে দিচ্ছে শ্যাওলা। আবার চিৎকার করে ডাকল সে। কোন ফল হলো না। বেশিদূর এগোল না তার ডাক। সাড়াও মিলল না।

আবার চিৎকার করল।

জবাব নেই।

তার জন্যে অপেক্ষা করল না কেন রেজা? হয়তো দু-ভাগ যে হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ, এটা খেয়ালই করেনি। খোলা পেয়েছে, ঢুকে পড়েছে। মাথায় বাড়ি না লাগলে সে নিজেও বুঝতে পারত

না। যেটা খোলা পেত, সেটা দিয়েই ঢুকে যেত।

মাথা গরম হতে দিল না সে। তাতে বিপদ বাড়বে। শান্ত ভাবে ভাবার চেষ্টা করল—কি ঘটতে পারে? সুড়ঙ্গটা যে ভাগ হয়েছে রেজা এটা খেয়াল না করলে যেটা সোজা গেছে সেটা দিয়েই ঢুকবে। মোড় নিয়েছে যেটা সেটা দিয়ে নয়। তাহলে সোজা গেছে কোনটা? কি ভাবে বোঝা যাবে?

গাঢ় অন্ধকারে সেটা বোঝা কঠিন।

দুটো সুড়ঙ্গই সোজা গেছে মনে হচ্ছে।

ভীষণ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ভয়ে নয়, আসলে পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে সে। পরিশ্রম হবেই, রয়েছে খাড়া পর্বতের ঢালে। হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।

কিন্তু মন কি আর ফাঁকিতে পড়ে? ঠিকই বুঝতে পারছে, পরিশ্রমে নয়, বুক কাঁপছে প্রচণ্ড ভয়ে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছে তার।

অন্ধকার এই গর্তের মধ্যে বোঝার উপায় নেই কোথায় ঘাপটি মেরে আছে ধারাল দাঁত-নখওয়ালা হিংস্র জানোয়ার, কিংবা মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। কোনদিকে যাচ্ছে তা-ও বোঝা যায় না। যদি দেখতে পেত, এতটা অনিশ্চয়তায় ভুগত না।

ছুরি দিয়ে ছাতে খোঁচা মেরে দেখল। গায়ে গায়ে জড়িয়ে গিয়ে শক্ত রবারের মত হয়ে আছে শ্যাওলা। কাটার জন্যে

খুঁচিয়েই চলল। হাত ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু থামল না সে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ছাত দিয়ে দেখা গেল এক চিলতে আলো।

দ্বিগুণ উদ্যমে খোঁচাতে থাকল সে।

মাথা গলানোর মত একটা ফোকর করে ফেলল।

আলোয় মাথা বের করতে পারাটা একটা বিরাট স্বস্তি। কিন্তু লাভটা কি? চারদিকে যেদিকেই তাকায় কেবল শ্যাওলা, শ্যাওলা আর শ্যাওলা। তা-ও বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। কুয়াশায় গিলে নিয়েছে যেন শ্যাওলার বনকেও।

কোনটা যে কোন দিক, বাইরেটা দেখে আরও অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিছু বোঝার উপায় নেই। ভেতরে তো অন্তত দুটো সুড়ঙ্গ আছে, যে কোন একটা বেছে নিতে পারে, এখানে কি আছে? কিচ্ছু না।

আবার মাথা নিচু করে ফেলল। হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোল ডানের সুড়ঙ্গ ধরে।

ভাইয়ের নাম ধরে ডাকল আবার।

সাড়া নেই।

বুঝল, এ ভাবে ডেকে ডেকে অহেতুক দমই শেষ করবে, লাভ হবে না।

ছড়ে যাওয়া তালু আর হাঁটুতে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। প্রতিবার হাত বাড়াতে গিয়েই মনে হচ্ছে এই বুঝি হাতটা পড়ল মসৃণ, পিচ্ছিল কোন ঠাণ্ডা কিলবিলে শরীরে।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠবে সরীসৃপটা, ছোবল মারবে।

কিন্তু তেমন অঘটন ঘটল না।

আরেকটা দুই-সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছল সে।

ডানে যাবে না, বাঁয়ে?

দুটো একই রকম মনে হলো তার, বাঁয়েরটাই ধরল।

একটু পরেই থেমে গেল। কান পেতে আছে। সামনে মৃদু একটা খসখস শব্দ। এগিয়ে আসছে।

কিছু একটা আসছে!

আশা করল, ছোট কিছু হবে—নির্বিষ, ক্ষতি করতে পারবে না, এমন কিছু, শজারু কিংবা খরগোশ। কিন্তু অত ছোট জানোয়ার এমন শব্দ করতে পারবে না। শব্দটা হচ্ছে সুড়ঙ্গের ছাত আর দেয়ালে ঘষা খাওয়ার ফলে।

দ্রুত মনের পর্দায় খেলে গেল ভয়াবহ কতগুলো জন্তুর মুখ। প্রাণীটা গরিলা, দানবীয় পিঁপড়ে ভালুক কিংবা জঘন্য হায়েনা হতে পারে। তিনটেই সাংঘাতিক জীব। শুয়োরও কম বিপজ্জনক নয়। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত ওগুলোর। চোখের পলকে চিরে ফালাফালা করে দিতে পারে।

এ রকম বদ্ধ জায়গায় সবচেয়ে মারাত্মক হলো চিতাবাঘ।

ভাবনাটা অবশ করে দিতে চাইল তার শরীর।

পিছিয়ে যাবে?

লাভ নেই। যত তাড়াতাড়িই পিছাক, তার চেয়ে অনেক দ্রুত ছুটে আসতে পারবে চিতাবাঘ। ধরে ফেলতে কয়েক

সেকেণ্ডও লাগবে না।

ভয় পেয়েছে সে এটা বুঝতে পারলে আরও সাহস হয়ে যাবে বাঘটার। দ্বিধা থাকবে না আর, আক্রমণ করতে ছুটে আসবে।

মনে পড়ল রেজার কথা—ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করবি···

কিন্তু শুয়োর হওয়ার ইচ্ছে নেই তার। জানোয়ারই যখন হতে হবে, চিতাবাঘই হবে, গর্জন করবে।

এমন গর্জন শুরু করল, দুনিয়ার কোন চিতাবাঘই তা পারবে না। একই সঙ্গে সামনের দিকে ছুটে গেল আক্রমণের ভঙ্গিতে। জানোয়ারটা সাহস সঞ্চয় করার আগেই তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হবে।

গর্জনের জবাবে গর্জন। জবাবটাও কম ভয়ঙ্কর নয়।

আরও জোরে গর্জন করতে লাগল সুজা। মনে হচ্ছে ফুসফুস ফেটে যাবে। চার-হাত পায়ে ভর দিয়ে জন্তুর মত করে যতটা জোরে সম্ভব ছুটে গেল সামনের দিকে।

ঠাস করে মাথায় মাথায় বাড়ি লাগল।

'উফ্!' করে উঠল চিতাবাঘটা।

'উফ!' করে উঠল সে নিজেও।

বসে পড়ল দুই চিতাবাঘ। হাসতে লাগল। ভীতুর হাসি। কারণ দু-জনেই ভয় পেয়েছে সাংঘাতিক।

'এখানে তোর দেখা পাব, কল্পনাই করিনি,' রেজা বলল।

'মুখটার কাছে অপেক্ষা করিসনি কেন? দু-ভাগে ভাগ

হয়েছে যেখানটায়।'

'দু-ভাগ? বুঝতেই পারিনি! এখন বল দেখি, ভুল পথে এলি কি করে?'

'আন্দাজে ঢুকে পড়েছি দুই সুড়ঙ্গের একটাতে।'

'ঘুরতে পারবি?'

চেষ্টা করল সুজা। শরীর বাঁকিয়ে, মুচড়ে-টুচড়ে, অনেক ভাবে। শেষে বাদ দিল চেষ্টা।

'পারব না। বেশি সরু।'

'তাহলে পিছাতেই হবে তোকে, উপায় নেই। বেশি দূর যেতে হবে না, ভাবিসনে, এই পাঁচ থেকে দশ মাইল!' তিক্ত কণ্ঠে বলল রেজা।

কিছু ভাবল সুজা। শান্তকণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও, পাঁচ মিনিটেই ঘুরে যাব।'

'কি করে?'

হাসল সুজা, 'জাদু জানি আমি। এসো।'

পিছাতে লাগল সুজা। চলে এল দ্বিতীয় দুই-সুড়ঙ্গটার মুখে। পাশেরটাতে ঢুকে চুপ করে বসে রইল। তার পাশ কাটিয়ে গেল রেজা। তখন পিছু নিল সে।

রেজা ভাবল, এখনও তার সামনেই রয়েছে সুজা। হঠাৎ পেছনে এক ভয়াবহ গর্জন শুনে চমকে উঠল। অপেক্ষা করছে চিতাবাঘের ধারাল নখের আঁচড়ের। তার বদলে খোঁচা লাগল ছুরির মাথার।

'তুই! পেছনে গেলি কি করে!'

'বললাম না, জাদু।'

'আরে বাবা অত মশকরা করছিস কেন? বলেই ফেল না।'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল সুজা।

একটা ঘণ্টা হামাগুড়ি দিল ওরা।

তারপর থেমে গেল রেজা। 'আমার হাতও শেষ, হাঁটুও শেষ। আর কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারব না! জানোয়ার হয়ে বাঁচতে হবে।'

চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সুজা। 'না ঘুমিয়ে আর পারব না আমি। যাও, ঘুরে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষা করব।'

কিন্তু এখানে ঘুমানো অসম্ভব মনে হলো তার। শ্যাওল-বনে বুকে হেঁটে চলা কুৎসিত প্রাণীর অভাব নেই, ওগুলো জাগিয়ে রাখল তাকে। চুপ করে থাকলেই শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

কাঁপুনি উঠে গেল এক সময়।

'জমে যাচ্ছি ঠাণ্ডায়,' বলল সে। 'চলো, এগোই। না হলে শরীর গরম থাকবে না।'

'বাপরে বাপ, এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা! মনে হচ্ছে মেরু অঞ্চলে আছি!' আবার এগোতে শুরু করল রেজা।

খানিক দূর এগিয়ে থেমে গেল। 'এই সুজা, দেখ, মনে হয় এসে গেছি। আলো দেখতে পাচ্ছিস?'

নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল ওরা।

আলোটা বাড়ছে ক্রমে।

অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। আলো এত উজ্জ্বল লাগল, চোখই মেলতে পারল না ঠিকমত, মিটমিট করতে থাকল। রোদের জন্যে নয়, মেঘে ঢাকা সূর্য; এমন লাগছে বেশিক্ষণ একটানা অন্ধকারে থেকে দিবালোকে বেরিয়ে আসার কারণে।

'আমি মনে করেছিলাম বিষুবরেখার কাছাকাছি আছি,' সুজা বলল।

'তাই তো আছি। তবে সাগরসমতল থেকে অনেক ওপরে তো, তাই এত ঠাণ্ডা। আল্পস পর্বতের চূড়ার চেয়েও ওপরে আছি আমরা।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সুজা। 'যাহ্, বেশি বলে ফেলছ! তা কি করে হয়? মন্ট ব্ল্যাঙ্কের উচ্চতা পনেরো হাজার ফুট।'

'জানি। কিন্তু এটার চূড়া সতেরো হাজারের কাছাকাছি। আমরা আছি প্রায় ষোলো হাজার ফুট উঁচুতে।'

'মস্ত বড় পর্বতারোহী হয়ে গেলাম তো তাহলে। তাই তো বলি, এত শীত লাগে কেন! কিন্তু এত ওপরে, এই ঠাণ্ডাতেও যে দাবানল লাগতে পারে, জানতাম না। দেখো, কত ছাই।'

'ছাই? কুয়াশার জন্যে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না আসলে। ছাই কোথায়?'

'এই তো।'

'হাত রেখে দেখ।'

রাখল সুজা। হাতে লেগে গেল ভেজা ভেজা সাদা জিনিস।

'আরি, তুষার! বিষুব অঞ্চলে তুষার! স্বপ্ন দেখছি নাকি!'

'আরও দেখ। ওই যে, হ্রদটা, হোয়াইট লেক।'

কুয়াশা বড় বেশি সচল এখানে। এই সরছে, এই জমছে। সরে যেতে বেরিয়ে পড়েছে হ্রদটা। আক্ষরিক অর্থেই সাদা। পানির ওপরে পুরোটা বরফ হয়ে আছে। তার ওপর হালকা তুষারের আস্তরণ।

কেমন পাথুরে, মরু প্রকৃতি এখানকার। দানবীয় ফুল আর গাছপালা অনেক পেছনে পড়ে আছে। কুয়াশার চাদরের ওপাশে কোথাও রয়েছে পর্বতের আকাশ ফুঁড়ে ওঠা চূড়া। আছে বরফের নদী। যেখান থেকে যখন তখন হিমবাহ নেমে যায় নিচের খাঁড়ির দিকে।

কুয়াশা কুণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে নিচের আজব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, যেন এলিসের মত এক আজব দেশে এসে পড়েছে ওরা। যেখানকার সবই অদ্ভুত। পর্বতের কোলে বিশাল ছড়ানো আঙিনায় যেন বিষণ্ণ হয়ে ঘুমিয়ে আছে কালো হ্রদ ব্ল্যাক লেক। তার নিচে ব্যালকনিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন গ্রীন লেক, চারপাশের জঙ্গলের পটভূমিতে একটা রত্নের মত জ্বলছে।

নিচে, অনেক নিচে, পর্বতের পাদদেশে চোখে পড়ছে ছোট হোটেলটার চালাগুলো, যেখানে গেস্ট বুকে দেখেছে সেই সব বিখ্যাত মানুষদের নাম, যাঁরা এই পর্বতের চূড়ায় চড়ার বহু চেষ্টা

করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক রাজকুমার, কাউন্ট, ডিউক, এবং রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির লোয়েল টমাস জুনিয়র আর অ্যাডলাই স্টিভেনসনের মত অভিযাত্রীরা।

তবে গেস্ট বুকে খুব কম নামই লেখা আছে। আরও হাজার হাজার মানুষ সেই অনাদিকাল থেকে ঘুরে গেছে এই রহস্যময় পর্বতের পাদদেশ থেকে, চেষ্টা চালিয়েছে এর চূড়ায় ওঠার।

আবার এগিয়ে এল কুয়াশার ধূসর চাদর, চোখের সামনে বাধা হয়ে ঢেকে দিল নিচের অপরূপ দৃশ্য—হ্রদ, জঙ্গল, বাড়িঘর।

চন্দ্রপৃষ্ঠের চেয়েও বিস্ময়কর এই পর্বতের জন্যে চাঁদের পাহাড় নামটা মোটেও অসঙ্গত নয়!

এগারো

বাতাসে ক্রমাগত রূপ বদল করছে কুয়াশা। অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরি হচ্ছে—কোনটা স্তম্ভ, কোনটা গাছ, কোনটা বা আবার একশো ফুট লম্বা মানুষ।

'দেখো, ভাই, আমার গা ছমছম করছে,' সুজা বলল। 'ওই যে ওই কুয়াশার স্তরটাকে দেখো, মনে হয় যেন একটা হাতি। সাদা হাতি।'

আজব জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল রেজা। কুয়াশার মত আচরণ করছে না। কুয়াশা হলে এক আকৃতিও বেশিক্ষণ থাকত না, বাতাসেও সরে যেত। এই জিনিসটা সরছে না। একই জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটা সাদা হাতি, কিংবা সঠিক ভাবে বললে ছাই-সাদা হাতি।

চোখ ডলল রেজা।

এখনও আছে ওটা।

উত্তেজনায় টগবগিয়ে উঠল রক্ত।

এ সত্যি হতে পারে না। শ্বেতহস্তী খুব দুর্লভ। একটা সাদা

হাতির জন্যে ওদেরকে দুই লক্ষ ডলার দেবে বলেছে টোকিও চিড়িয়াখানা।

রেজার মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। তবে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন যে ভাবে দ্রুত বদলাতে থাকে, এটা তেমন করে বদলাচ্ছে না। এক রকম রয়ে গেছে।

কাছে এগোনোর চেষ্টা করলে হয়তো কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে হাতিটা। তখন নিশ্চিত হতে পারবে, স্বপ্ন, নাকি চোখের ভুল?

'দেখা যাক এটা সত্যি কিনা,' বলল সে। 'আয়। খুব আস্তে, এক পা এক পা করে।'

এগোতে লাগল ওরা।

নড়ল না দানবটা। মিলিয়ে গেল না। ভয় পেয়ে পালাল না। রেগেও গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো আর কখনও মানুষ দেখেনি। সুতরাং জীবগুলোকে ভয় পাবে, না ঘৃণা করবে, বুঝতে পারছে না।

আরও কাছে এসে রেজা দেখল, সাদাটা আসলে কুয়াশার জন্যে মনে হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার মধ্যে আরও হাতি তো দেখেছে আগে, ওগুলোকে তো এ রকম মনে হয়নি? এটাকে এখন হালকা ধূসর লাগছে। তাতে নিরাশ হলো না সে। জানা আছে, শ্বেতহস্তী বলতে ধবধবে সাদা হাতি নয়। তুষার শুভ্র হাতির কথা কেবল গল্প-কাহিনীতেই লেখা থাকে। বাস্তবে যেগুলোকে সাদা হাতি বলা হয়, সে-গুলোর চামড়া পুরো

কালো নয়, ফ্যাকাসে ধূসর।

একেবারে কাছাকাছি যেতে পারলে বুঝতে পারত, এই হাতিটার ফ্যাকাসে ভাবটা কতখানি বেশি। যত বেশি হবে, তত দাম বাড়বে।

সুজাও ভাইয়ের মতই সাবধানে এগোচ্ছে। শ্বেতহস্তীর দাম তারও জানা।

ওদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না হাতিটা।

দশ ফুটের মধ্যে চলে এল দু-জনে। তারপর থামল।

এই মুহূর্তটা জীবনে ভুলবে না ওরা। দম বন্ধ হয়ে আসছে উত্তেজনায়।

এটার চামড়ায় ফ্যাকাসে ভাবটা অনেক বেশি, সে-জন্যেই দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে সাদা লাগছিল। মাঝে মাঝে লালচে ছোপ। পিঠটা সাদা, ময়লা তুষারের মত, যেন তুষার জমা পর্বতের চূড়া। নখ সাদা, চোখের রঙ লালচে-সাদা। কান আর মাথায় সাদার মধ্যে লাল লাল ছোট-বড় ফুটকি।

আর কোন সন্দেহ নেই, শ্বেতহস্তীই এটা! মাদী হাতি।

সাদা হাতি যে, তার আরও একটা বড় প্রমাণ, কালো হাতির মত বদমেজাজী নয়। মারচিসন ন্যাশনাল পার্কে একটা সাদা গণ্ডার ছিল। অনেকেই লিখেছে ওটার কথা। খুব নাকি ভদ্র ছিল ওটা, সাধারণ গণ্ডারের মত বদমেজাজী নয়। সাদা খরগোশ, সাদা ইঁদুর, কালো কিংবা ধূসর জাতের পাখি যে-গুলো সাদা হয়ে যায়, সবই নাকি শান্ত স্বভাবের হয়। সাদা

রঙের তুষার-চিতাকে ভয় পায় না মানুষ। অথচ কালো চিতা আর কালো জাগুয়ার ভয়ানক হিংস্র হয়।

যে চিড়িয়াখানা এই হাতিটাকে পাবে, তারা অতি ভাগ্যবান। দর্শকদের জন্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে এটা। অনেক চিড়িয়াখানার এই হাতি কেনার সামর্থ্যই নেই। জাপানীদের আছে, দুর্লভ জানোয়ারের জন্যে তারা খরচও করে। ওরা ঘোষণা করেছে দুই লাখ ডলার দেবে, চাপাচাপি করলে আরও অনেক বেশিও দিতে পারে, বিশেষ করে এই হাতিটার জন্যে।

মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে এতগুলো টাকা, অথচ ধরে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় দেখছে না ওরা। এতবড় একটা হাতির বিরুদ্ধে দুটো ছেলে কিছুই করতে পারবে না। ধরতে হলে অনেক লোকবল দরকার। এই সাফারির জন্যে যত লোক ভাড়া করেছে ওরা, সবাইকে নিয়ে এলেও হয়তো কাজ হবে না। একটাই কাজ করার আছে আপাতত, জানোয়ারটাকে বিরক্ত না করে, চমকে না দিয়ে চুপচাপ পিছিয়ে যাওয়া। তারপর লোকজন নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসা।

হাতিটার ওপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে পিছাতে শুরু করল দু-জনে। যে ভাবে এগিয়েছিল, তার চেয়ে সাবধানে।

হঠাৎ কানের কাছে কথা বলে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ।

চমকে ফিরে তাকাল ওরা।

ছয়জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আরবদের সাদা

পোশাক। হাতে পিস্তল আর তলোয়ার।

'দৌড় দেব নাকি?' সুজা বলল।

'লাভ নেই। গুলি করে মেরে ফেলবে। বরং কথা বলে দেখি।' বাংলা বোঝার প্রশ্নই ওঠে না, ইংরেজিও যে বোঝে না সেটা বোঝা গেল জিজ্ঞেস করতেই। নেতার কাছে জানতে চাইল রেজা, 'ইংরেজি জানেন?'

জবাবে রাগী ভঙ্গিতে মাথা নাড়ানো আর কিছু আরবি শব্দের তুবড়ি। আকামি যা বলেছে, ঠিক সে-রকম ওদের গায়ের রঙ—সাদাও না, কালোও না। মরুভূমিতে জন্ম, সেখানকার রোদ গাঢ় বাদামী করে দিয়েছে ওদের চামড়া। মাথায় পাগড়ি জড়ানো। পা খালি, জুতো-স্যাণ্ডেল কিছু নেই। তুষার মাড়াচ্ছে, অথচ ভঙ্গি দেখে মনে হয় না কোন অসুবিধে হচ্ছে। কঠিন লোক ওরা।

কথা বলতে বলতে একবার হাতিটার দিকে, একবার ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছে নেতা।

ওদের উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারছে রেজা।

'তাঁবুতে হামলা মনে হয় এরাই চালিয়েছে,' বাংলায় বলল সে। 'কোনভাবে জেনেছে, হাতি ধরতে এসেছি আমরা। ওরাও এসেছে একই উদ্দেশ্যে। আমাদের হাতিগুলো ওরা চুরি করেছে। এটাকে ধরতেও বাধা দেবে।'

'এমন ভঙ্গি করো, যেন কোনই আগ্রহ নেই আমাদের।'

'তাই করতে হবে। চুপচাপ সরে পড়ি চল। অবশ্য যদি

যেতে দেয়।'

যেতে দিল না ওরা। যেই পা বাড়াল ছেলেরা, পিস্তলের নল ঠেসে ধরা হলো পিঠে। কাপড় ছিঁড়ে চোখ বেঁধে ফেলল। কেড়ে নেয়া হলো ছুরি দুটো। তারপর এগোনোর জন্যে বেশ জোরে, ব্যথা দিয়ে খোঁচা মারল পিঠে।

চলতে চলতে পাথরে পিছলে, হোঁচট খেয়ে, কিংবা উঁচু-নিচুতে তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইলেও পিঠে খোঁচা। কখনও গালাগাল, কখনও তলোয়ারের খোঁচাও সহ্য করতে হচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' সুজার প্রশ্ন।

'বোধহয় ওদের ক্যাম্পে। জায়গাটা কোথায় গোপন রাখতে চায়, সে-জন্যেই চোখ বেঁধেছে।'

'নিয়ে গেলে ভালই হয়। আউরোকে দেখতে পাব। মুক্ত করতে পারব।'

জবাব দিল না রেজা। ভাইয়ের দুঃসাহস যে কতখানি, ভাল করেই জানে সে। যত সহজে মুক্ত করার কথা বলছে, একদল গলাকাটা ডাকাতের হাত থেকে কাজটা যে তত সহজ হবে না, সুজা নিজেও বুঝতে পারছে। তবু আশা ছাড়ছে না।

খুব কষ্ট হচ্ছে এগোতে। শ্যাওলার সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়েই কাহিল হয়ে গেছে। এখন এই দুর্গম পথ। তার ওপর খিদে। পা চলতে চায় না। তবে একটাই স্বস্তি, এই হাঁটাহাঁটির ফলে শরীরটা গরম রয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও জমে যায়নি এখনও।

অবশ্য পিঠে ধারাল তরবারির ফলা ঠেকে থাকলে, আর কখন খচ করে ঢুকে যায় ভাবলে এমনিতেই গরম হয়ে থাকে শরীর।

সোজাসুজি না গিয়ে এদিক ওদিক ঘোরানো হলো ওদের, কোন দিকে যাচ্ছে দ্বিধায় ফেলে দেয়ার জন্যে, যাতে পথ চিনতে না পারে।

তবে একটা ব্যাপারে অসাবধান হলো ডাকাতেরা, বাতাস। এ অঞ্চলে আসার পর থেকে লক্ষ করেছে রেজা, বাতাস বয় পশ্চিম থেকে পুবে। অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে যখন সোজা এগোল ওরা, খেয়াল করল বাতাস লাগছে তার পিঠে। তথ্যটা মনে গেঁথে নিল সে। ডাকাতের আস্তানা থেকে বেরোতে পারলে বাতাসের বিপরীতে এগোতে হবে। তাহলে পৌঁছে যাবে হোয়াইট লেকে, সেখান থেকে ব্ল্যাক লেক আর গ্রীন লেক পেরিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারবে।

কিন্তু যদি মুক্তি পায় ডাকাতদের কবল থেকে, তবে তো; মস্ত একটা 'যদি' রয়ে যাচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই একটানা চলার পর সামনে কথার শব্দ শোনা গেল।

হঠাৎ করে পিঠ থেকে সরে গেল বাতাস এবং তলোয়ার, দুটোই। বেশ উষ্ণ এখানে আবহাওয়া। রান্নার সুগন্ধ ভুরভুর করছে।

বন্দিদের চোখ থেকে কাপড় খুলে নেয়া হলো।

বিরাট এক গুহায় এসে ঢুকেছে ওরা। সে জন্যেই আর

বাতাস লাগছে না পিঠে। মশালের আলোয় আলোকিত। আগুনের বড় কুণ্ড গরম করে রেখেছে গুহাটা। ছাত থেকে স্ফটিকের ঝাড়বাতির মত ঝুলে আছে স্ট্যালাকটাইট। ঝালর লাগানো দামী কাপড়ে ঢাকা দেয়াল। মেঝেতে চিতাবাঘের চামড়ার কার্পেট। সাদা আলখেল্লা পরা মানুষেরা বসে আছে তাতে। বাঘের মাথাকে তাকিয়া বানিয়ে ঠেস দিয়েছে। হাতে পুদিনার গন্ধ মেশানো চায়ের পেয়ালা।

'এ কোথায় ঢুকলাম রে!' রেজা বলল। 'মনে হচ্ছে হাজার বছর পেরিয়ে এসে ঢুকেছি আরব্য রজনীর জগতে!'

'কিংবা কাউন্ট মন্টিক্রিস্টোর প্রাসাদে!' বিড়বিড় করল সুজা।

বারো

'তোমাদের পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম!' ইংরেজিতে কথা বলল কেউ।

সাংঘাতিক ভারি কণ্ঠস্বরটা এল যেন গুহার দেয়াল ভেদ করে। জবাব যখন দিয়েছে, নিশ্চয় তাদের বাংলা বুঝতে পেরেছে। এই বিদেশ-বিভুঁইতে বাংলা বোঝে কেউ, এটা জেনে হাঁ হয়ে গেল দুই ভাই।

বিশালদেহী একজন মানুষ। সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সেই পরিমাণ চওড়া। অন্যদের মত সাদা পোশাক পরেনি। বরং তার আলখেল্লাতে রামধনুর সাতটা রঙই বিদ্যমান, খুব দামী, চমৎকার সিল্কের কাপড়ে তৈরি, মশালের আলোয় চকচক করছে। সোনা-রূপায় তৈরি, মূল্যবান পাথর বসানো একটা ব্রেস্ট প্লেট পরেছে বুকে। মাথায় পাগড়ির বদলে রয়েছে সিংহের কেশরে বানানো মুকুটের মত একটা জিনিস। কোমরের বেল্টের জন্যে জীবন দিতে হয়েছে একটা তুষার-চিতাকে। একপাশে খাপে ঝোলানো অলঙ্করণ করা একটা বড়

পিস্তল, আরেক পাশে তলোয়ার। সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি করা স্লিপার পায়ে, রেজার পায়ের প্রায় দ্বিগুণ হবে একেকটা পা। বিশাল পায়ের ছাপের কথা মনে পড়ল তার।

দাস ব্যবসায়ীদের সর্দার লোকটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। একেই উয়াটুসিরা বজ্রমানব বলে জানে।

কিন্তু এক্ষণে বজ্রমানবের মুখে মেঘ বা বজ্রের কোন চিহ্ন নেই, তার জায়গায় রয়েছে উজ্জ্বল রোদ। তামাটে রঙের মুখে ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত।

মাথা নুইয়ে সালাম জানাল লোকটা। ইংরেজিতে বলল, 'বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। আমার তেলের কোম্পানিতে অনেক বাংলাদেশী আর ভারতীয় আছে, তারা বাংলায় কথা বলে। নোয়াখালীর একজন ফোরম্যানের কাছে অল্প-স্বল্প বাংলা শিখেছি। যাই হোক, আমার বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। বিশ্রাম দরকার। এসো আমার সঙ্গে।'

লোকটার মোলায়েম ব্যবহারে পিত্তি জ্বলে গেল রেজার। অনেকগুলো বাজে কথা মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু চেপে গেল। এ সব বলার সময় নয় এখন।

পর্দা সরিয়ে আরেকটা ছোট গুহায় ঢুকল বজ্রমানব। এটা আরও জমকালো করে সাজানো। চিতার চামড়ার ওপর রাখা পুরু গদি। নরম বালিশে হেলান দিয়ে তাতে আধশোয়া হলো লোকটা। রেজা-সুজাকেও গদি দেখিয়ে আরাম করতে বলা

হলো।

কঠোর পরিশ্রমের পর গা এলিয়ে দিতে পেরে খুশিই হলো ওরা।

ট্রে হাতে ঢুকল একজন চাকর। ট্রেতে পুদিনার সুগন্ধ দেয়া তিন কাপ গরম চা আর কিছু কেক।

'দেখো আমাদের চা খেতে পারো কিনা,' বজ্রমানব বলল। 'কফি দিতে পারলাম না, নেই, সরি। ইউরোপ-আমেরিকায় ঘোরার সময় কফিই খাই, তবে বাড়ি ফিরলে চা।'

'এটা আপনার বাড়ি?' জিজ্ঞেস করল রেজা।

'না না,' হেসে উঠল বজ্রমানব। 'এটা সাধারণ শিবির। পারস্য উপসাগরের তীরের একটা অঞ্চলে পঞ্চাশ হাজার মানুষের আমি শেখ। টাকার অভাব নেই আমার। কিন্তু শুধু টাকায় মন ভরে না, অ্যাডভেঞ্চারের প্রবল নেশা, তাই বেরিয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসি গুহায়। লোক রেখে আসি আমার প্রজাদের প্রতি যাতে কোন অবিচার না হয় সেটা দেখার জন্যে, আর আমি এসে এখানে আইন ভাঙি।'

'বেআইনী কাজ যে করেন স্বীকার করছেন?'

'করব না কেন? যেটা তোমরা জেনেই গেছ, সেটা লুকিয়ে লাভ কি? কয়েকবার গেছি তোমাদের ক্যাম্পে। তোমাদের বন্ধু উয়াটুসিদের গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজনকে ধরে এনেছি, খুব ভাল চাকরের কাজ করতে পারে ওরা। ওদেরকে এমন লোকের কাছে পাঠাই, যারা ভাল টাকা দেয়।'

'সর্দারের ছেলেকে ধরে এনেছেন। তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'না, এখনও এখানেই আছে। দেখতে চাও?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হাততালি দিল শেখ।

একজন চাকর ঢুকল।

আরবিতে তাকে হুকুম দিল শেখ।

খানিক পর পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল আউরো। বন্ধুদের দেখে আনন্দে চিৎকার করে ছুটে এসে তাদের হাত চেপে ধরল।

'তোমরা এসেছ! জানতাম আমাকে নিতে আসবে!'

'তোমাকে নিতে আসিনি,' শুকনো স্বরে বলল রেজা। 'আমরাও তোমার মতই বন্দি। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।'

দপ করে আলো নিভে গেল ওগারোর মুখ থেকে।

'ও। যাই হোক, হাসিমুখে মিঠে মিঠে কথা বলছে, খাবার দিচ্ছে বলেই এই শেখকে বিশ্বাস কোরো না। ও খুনী।'

হা হা করে হেসে উঠল শেখ।

'ছেলেটাকে আমার ভীষণ পছন্দ। ওর তেজ আছে। এ ভাবে আমার সামনে কথা বলতে সাহস করে না কেউ। সর্দারের ছেলে তো, সর্দারের মতই কথা।'

কালো হয়ে গেল তার মুখ। বুনো রাগ ফুটল চোখের তারায়। দূর হয়ে গেল হাসি হাসি ভাবটা।

'তবে সর্দারের ছেলেরা বেয়াদব হয়, ওকে আদব শিক্ষা দেব আমি! কিছু শিক্ষা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। এই ছেলে, ঘোরো, দেখাও তোমার বন্ধুদের।'

নড়ল না আউরো।

আরবিতে তীক্ষ্ণ আদেশ দিল শেখ। দৌড়ে ঘরে ঢুকল একজন চাকর। আউরোকে চেপে ধরে জোর করে তার পিঠ ঘোরাল রেজা-সুজার দিকে। চামড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়া হয়েছে পিঠ।

মৃদু হাসল শেখ।

কড়া গলায় বলল সুজা, 'লাগতে হলে সমানে সমানে লাগা উচিত। একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে সবাই পেটাতে পারে, এতে বীরত্ব জাহির হয় না। কথা না শুনলে কি করবেন? পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবেন?'

'না না, মারব কেন? টাকা আসে এমন কোন কিছুকেই মেরে ফেলি না আমি। ভাল গোলাম হবে ও। তবে তার আগে ওর তেজটা নষ্ট করতে হবে। ঘোড়াকে যেমন করে বশ মানানো হয়।'

'এই নিষ্ঠুরতার কি কোন প্রয়োজন আছে?' রেজার প্রশ্ন।

'নিষ্ঠুর? কি বলছ তুমি? আমরা অনেক ভদ্র। কি দিয়ে মেরেছি, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।'

দেয়ালে ঝোলানো খুব সাধারণ দেখতে একফালি চামড়া নামাল শেখ।

'দেখো হাত দিয়ে,' বলল সে। 'একেবারে নরম। আমাদের ভাষায় একে যা বলে তার বাংলা করলে দাঁড়াবে কোমল শিক্ষা।'

'মনে করেছেন চিনি না,' রেজা বলল। 'অত্যাচার করার জন্যে যত খারাপ জিনিস বানিয়েছে মানুষ, তার মধ্যে এটা একটা। দক্ষিণ আফ্রিকায় একে বলে স্যামবক। গণ্ডারের চামড়া কেটে বানিয়ে সিংহের চর্বি ডলে নরম করা হয়। নরম করাই হয় যাতে মারলে বেশি ব্যথা লাগে। এর প্রতিটি ইঞ্চি চামড়ায় ছুরির মত কেটে বসে যায়। আপনার মত নিষ্ঠুর মানুষেরা যারা একটা ছেলেকে পেটাতে দ্বিধা করে না, তারাই কেবল একে কোমল বলতে পারে। নিজের পিঠে পড়লে আর এই নাম রাখত না।'

জ্বলে উঠল বজ্রমানবের চোখের তারা, তবে মুখে হাসি লেগে রইল।

'মনে হচ্ছে তোমাদের এই বন্ধুটির মত একই শিক্ষা দরকার তোমাদেরও। তবে সেটা না করতে হলেই খুশি হব আমি। বেয়াদবি আমি সইতে পারি না। যারা করে, তাদেরকে আদব শিখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।' চাকরের দিকে চাবুকটা ছুঁড়ে দিল শেখ। সেটা লুফে নিয়ে আউরোকে সহ পর্দার ওপাশে চলে গেল চাকর।

ছেলেদের দিকে তাকাল শেখ। 'আশা করি ওর পিঠে আরও বিশ ঘা চাবুক ওকে তো বটেই, তোমাদেরও ভদ্র হতে

শেখাবে। পর্দার ঠিক ওপাশেই কাজটা করা হবে, যাতে চিৎকারটা তোমরাও শুনতে পাও।'

চাবুকের প্রথম বাড়িটা পড়তেই বাঘের মত লাফিয়ে উঠল সুজা।

টেনে তাকে বসিয়ে দিল রেজা।

'কিছু করলে আউরোর ক্ষতিই করবি শুধু। বসে থাক। সুযোগ আমাদের আসবে।'

বিশটা বাড়ি শেষ হলো। টুঁ শব্দ শোনা গেল না আউরোর। নিরাশ হলো শেখ, তার চেহারাই সেটা বলে দিচ্ছে। প্রতিটি বাড়ি পড়েছে আর দাঁতে দাঁত চেপেছে রেজা-সুজা, যেন তাদের নিজের পিঠে পড়েছে।

শেষ হয়ে গেলে শেখ বলল, 'ওরটা আপাতত শেষ। এবার তোমাদের ব্যবস্থা। হয়তো ভাবছ ধরে নিয়ে আসা হলো কেন?'

'আমাদেরও গোলাম বানানোর ইচ্ছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রেজা।

'না। তোমাদের কিনতে রাজি হবে না কেউ। তোমাদের দিয়ে কাজ তো হবেই না, অকারণে ঝামেলা বাড়াবে। শ্বেতাঙ্গর গন্ধ সইতে পারে না আমার বন্ধুরা। তোমরা শ্বেতাঙ্গ নও বটে, তবে ওদের সঙ্গে থেকে থেকে ওদেরই মত হয়ে গেছ। বশ মানানো কঠিন। সব সময় খালি পালানোর চিন্তায় থাকে। যেহেতু তোমরা আমেরিকার নাগরিক, তোমাদের

সরকারও গোলমাল করতে পারে। না, কোটিপতির প্রাসাদের আরামের জীবন তোমাদের জন্যে নয়। ভাগ্য এত ভাল নয় তোমাদের।'

'তাহলে আটকে রেখেছেন কেন?'

'কারণ আছে। জানোয়ার ধরার ওস্তাদ তোমরা। আজ একটা সাদা হাতির কাছে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে আমার লোকেরা। এত দামী জানোয়ার সারা দুনিয়ায় আর নেই। তোমরা ওটাকে ধরার চেষ্টা করবেই। তাই তোমাদের ঠেকিয়েছি।'

'কেন? ওটাকে ধরে এনে তো আর গোলাম বানাতে পারবেন না।'

'তা ঠিক। তবে আমি জানি ওটাকে কোথায় বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। একটা হাতির দামে দশটা ক্যাডিলাক গাড়ি কিনতে পারব। হাতিটা ধরে বিক্রি না করা পর্যন্ত তোমাদের আটকে রাখতেই হচ্ছে।'

'ততক্ষণ কি আমার লোকেরা বসে বসে আঙুল চুষবে মনে করেছেন? ওরা আমাদের খুঁজবে। খুঁজে বের করবে এই গুহা। দলে ওরা অনেক, সেই তুলনায় আপনারা অনেক কম। শুধু শুধু প্রাণ খোয়াবেন। প্রাণের চেয়ে কি বড় হয়ে গেল একটা হাতি?'

কুটিল হাসি হাসল বজ্রমানব।

'সাধারণ হাতি হলে অন্য কথা ভাবতাম। কিন্তু শ্বেতহস্তী সাধারণ নয়। জানো, অনেক দেশে দেবতা মানে একে?

পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছি আমি, বার্মায় গেছি, সিয়ামে গেছি—থাইল্যাণ্ডকে অনেকে বলে সিয়াম, আমারও এই নামটাই ভাল লাগে। শ্বেতহস্তীকে নিয়ে যে কি করে ওরা, না দেখলে বুঝবে না।'

'পাগল-ছাগল সব দেশেই আছে,' মুখ গোমড়া করে বলল সুজা।

'তা বলতে পারো। মস্ত এক ধনীর বাড়িতে একবার একটা সাদা হাতি দেখেছিলাম। মার্বেল পাথরে বাঁধানো শানদার বিশাল এক চত্বরে ওটাকে রাখা হত। সোনা-রূপার কারুকাজ করা অনেক দামী সিল্কের কাপড়ে সারাক্ষণ ঢেকে রাখা হত ওটার পিঠ। কাপড়ের ঝুলগুলোর কি বাহার, একেবারে গোড়ালির ওপর নামানো। সোনার মালা বানিয়ে পরিয়ে রাখা হত দাঁতে। মাথার ওপর ধরে রাখা হত রাজকীয় ছাতা, যাতে রোদে কষ্ট না পায় হাতি।

'হাতির সেবা করার জন্যে অস্থির হয়ে থাকত অনেক বড় বড় নামী-দামী মানুষেরা। কেউ উটপাখির পালকের পাখা দিয়ে বাতাস করত, কেউ গা থেকে মাছি তাড়াত, কেউ বা সোনার পাত্র থেকে তুলে নিয়ে দুর্লভ ফল খাওয়াত ওটাকে।

'নদীতে নিয়ে যাওয়া হত গোসল করানোর জন্যে। তখন সোনার সুতোয় কাজ করা কাপড়ে ঢেকে দেয়া হত ওটার শরীর। আটজন লোক ওই সময় সদাব্যস্ত থাকত ওটার সেবায়, কোন ভাবে যেন কোন কষ্ট না হয়। বাজনা বাজাতে বাজাতে

আগে আগে যেত ব্যাণ্ড পার্টি। নদী থেকে গোসল সেরে এসে চত্বরে উঠলে রূপার গামলায় করে গরম পানি এনে পা ধুইয়ে দেয়া হত হাতির, তারপর সুগন্ধী মাখিয়ে দেয়া হত।'

'গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ব্যাটাদের,' গজগজ করতে লাগল সুজা। 'নির্বোধের দল! একটা হাতিকে নিয়ে এই কাণ্ড!'

হাসল শেখ। 'ওটা হাতি নয় ওদের কাছে, দেবতা। দেবতার পূজা তো করবেই। ওই হাতি মারা গেলে তাকে রাজার সম্মান দেয়া হয়েছে। বিশাল মঞ্চে সাতদিন শুইয়ে রাখা হয়েছে লাশ। তারপর চন্দন কাঠের মত দামী কাঠ দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। পোড়া ছাইগুলোও সাংঘাতিক পবিত্র, নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিনরাত কড়া নজর রেখেছে প্রহরীরা, যাতে কেউ নিতে না পারে। সেই ছাই কুড়িয়ে নিয়ে দামী বাক্সে ভরে কবর দেয়া হয়েছে এমন জায়গায়, যে গোরস্থানে রাজারাজড়াদেরই কেবল ঠাঁই মেলে।

'শ্বেতহস্তীর ব্যাপারে নানা মজার মজার কিচ্ছা-কাহিনীও চালু আছে। এক সময় নাকি গোটা পৃথিবীটা ছিল বিশাল এক সাদা হাতির পিঠে। হাতিটা কোন কারণে নড়লেই পৃথিবীও কাঁপত, ফলে ভূমিকম্প হত। একবার রানী ভিক্টোরিয়াকে কি উপহার দিয়েছিলেন সিয়ামের এক রাজা, জানো? একটা সোনার বাক্স, তার তালা খোলার চাবিটাও সোনার। সবাই ভেবেছিল এত দামী বাক্সে করে নিশ্চয় দামী দামী পাথর কিংবা অলঙ্কার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাক্স খুলে দেখা গেল তা

রয়েছে রাজার সাদা হাতির কয়েকটা রোম। রাজার কাছে মনে হয়েছিল, ইংল্যাণ্ডের রানীকে পাঠানোর জন্যে এর চেয়ে দামী জিনিস আর তাঁর সাম্রাজ্যে নেই। আর সিয়ামের রাজদূত রানীর প্রশংসা করার সময় বলেছেন, রানীর চোখ, ভাবভঙ্গি, এবং আরও অনেক কিছুই একেবারে সাদা হাতির মত। এরপরও বলতে চাও এই হাতি সাধারণ হাতি?'

'না,' মাথা নাড়ল সুজা, 'দামের দিক থেকে অসাধারণ। মানুষই এর দামটা বাড়িয়েছে। প্রাণী হিসেবে আর দশটা সাধারণ হাতির মতই হাতি এটাও।'

মাথা ঝাঁকাল শেখ। 'বুদ্ধিমান ছেলে। আমার কাছেও দামটাই বড়। যাই হোক, ওই হাতি যতদিন ধরা না পড়ে তোমরা আমার মেহমান। উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না, আমিও তোমাদের কিছু করব না। কিন্তু আমার কাজে নাক গলাতে এলে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না, এটা মনে রেখো।'

তেরো

হাততালি দিল শেখ।

চোখের পলকে উদয় হলো চাকর।

ছেলেদেরকে শেখের গুহা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো পেছনের বড় গুহায়। পুরোপুরি অন্ধকার এখন ওটা। খালি।

গুহার চারপাশে অনেক পর্দা ঝোলানো। ওগুলোর অন্যপাশের ছোট গুহা থেকে আসছে নাক ডাকানোর শব্দ। কোন কোনটাতে কথা বলছে একাধিক লোক, তাসটাস খেলছে হয়তো, ঘুমায়নি এখনও।

বড় গুহার পেছনের ছোট একটা গুহায় রেজা-সুজাকে নিয়ে আসা হলো। পুদিনা মেশানো চায়ের কড়া গন্ধ এখানে। অগ্নিকুণ্ডের ওপর বিরাট পাত্রে চা তৈরি হচ্ছে, বাষ্প উঠছে ওটা থেকে, পুদিনার গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটিমাত্র মশাল জ্বলছে গুহাটায়, অন্ধকার কাটছে না। এখানে আরামের ব্যবস্থা নেই, চিতার চামড়ার কার্পেট নেই, গদি নেই। নগ্ন দেয়ালের গা

থেকে বেরিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা পাথর। ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে। এককোণে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা ছেলে, খালি গা। মানুষের সাড়া পেয়ে নড়ে উঠল। উঠে দাঁড়ালে চেনা গেল, সর্দার ওগারোর ছেলে।

'আউরো!' এগিয়ে গেল সুজা। 'এই জঘন্য জায়গায় এনে তোমাকে রেখেছে ওরা! উয়াটুসির রাজকুমারের জন্যে যোগ্য জায়গাই বটে!'

দুর্বল হাসি হাসল আউরো। 'এটা গোলামদের ঘর। পাচার করার আগে এখানেই বন্দি করে রাখা হয়। কাল পর্যন্ত অনেকেই ছিল। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জাহাজে তুলে দেয়ার জন্যে। লোহিত সাগরের কোন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা বলেছে, আমাকেও নিয়ে যাবে আগামী কাল, পারস্য উপসাগরের তীরে।'

ঘরটা দেখতে দেখতে বলল সুজা, 'মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরও এর চেয়ে ভাল। আর কিছু না থাক, ওসব ঘরে একটা খুদে জানালা হলেও থাকে, এটার তা-ও নেই।' আগুনে চাপানো পাত্রটার দিকে তাকাল। 'যাই হোক, এই ঠাণ্ডায় চা যে খেতে দিচ্ছে এটাই বেশি।'

'চা কি আর আমাকে দেয়? ওটা প্রহরীদের জন্যে। যাতে জেগে থাকতে পারে।'

'তোমাকে কি খেতে দেয় ওরা?'

'কিছু না। একেবারেই কিছু না। ওরা বলে, হাঁটু গেড়ে

বসে হাতজোড় করে যখন চাইব, তখনই কেবল দেবে। ওরা বলে, সর্দারের ছেলে আমি—এই ভাবনাটা মাথা থেকে বিদেয় না হলে ভাল গোলাম হতে পারব না। বলেছে, না ভোলা পর্যন্ত খেতে দেবে না। না দিক। না খেতে খেতে মরে যাব, তবু মাথা থেকে বিদেয় করব না।'

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গর্বিত কিশোরটির দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে রেজা। পিঠের জখমগুলোতে নিশ্চয় অকল্পনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু মুখের ভাবে সেটা একবিন্দু প্রকাশ পাচ্ছে না ছেলেটার। এই ছেলে ভাঙবে তবু মচকাবে না। সুযোগ পেলে অনেক বড় নেতা হতে পারবে।

কিন্তু আগামীকাল ওকে দেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হলে সেই সুযোগ আর কোনদিনই পাবে না আউরো। গোলামির ঘানি টেনেই কাটবে সারাজীবন। তাকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করা দরকার, এবং সেটা আজ রাতেই।

গুহাটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল রেজা। দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি, ছাত, মেঝে, কোন জায়গা বাদ দিল না।

কিন্তু কোন রকম ফাঁকফোকর দেখল না। খোলা জায়গা একটাই আছে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ওরা। সেটা পাহারায় রয়েছে ছয়জন প্রহরী। তিনজন বসেছে দরজার বাইরে, তিনজন ভেতরে। আলখেল্লার ঝুল পেতে বসেছে, যাতে ঠাণ্ডা এড়াতে পারে। চা খেতে খেতে নিচু স্বরে আলাপ করছে। বিশালদেহী মানুষ একেকজন। সঙ্গে পিস্তল আর তলোয়ার

রয়েছে।

ওরকম অস্ত্র থাকলে একজন লোকই নিরস্ত্র তিন বন্দিকে সামলানোর জন্যে যথেষ্ট। ছয়-ছয়জন সশস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই।

ছয়জনের কাছে যদি অস্ত্র না-ও থাকত, তাহলেও হাতাহাতি লড়াইয়ে কাবু করতে পারত কিনা সন্দেহ। তার ওপর ওদের চিৎকারে আরও লোক ছুটে আসত।

অলৌকিক কোন উপায়ে যদি কাবু করতে পারে এই ছয়জনকে, তাহলেও ঝামেলা শেষ হবে না। বড় গুহাটা পেরোতে হবে, যার চারপাশে ছড়িয়ে আছে ডাকাতদের ঘর। সবাই ঘুমোয়নি। হঠাৎ উঁকি দিয়ে বসতে পারে একআধজন। চোখে পড়ে গেলেই চিৎকার শুরু করবে, আবার ধরে আনা হবে ওদেরকে।

পালানোর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না রেজা। আপাতত হাল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়াই উচিত মনে করল। ঘুমিয়ে আগে ক্লান্তি দূর করা দরকার। কিন্তু যা শীতল মেঝে, ঘুম হবে বলে মনে হয় না।

বুশ জ্যাকেটের পকেটে শক্ত একটা কিছু ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে কোমরের নিচে, অস্বস্তিকর। সামান্য একটু নড়েচড়ে শুলো, যাতে চাপটা না লাগে।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। পকেটের জিনিসটা কাজে লাগানো যেতে পারে!

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুঁয়ে দেখল জিনিসটা। আধ ইঞ্চি ব্যাসের তিন ইঞ্চি লম্বা একটা বিশেষ কার্তুজ।

বড় জানোয়ার ধরার সময় হরদম ব্যবহার করা হয় এগুলো। ভেতরে সেরনিল নামে এক ধরনের তরল ঘুমের ওষুধ ভরা থাকে। মাথায় ইঞ্জেকশনের সুচের মত সুচ লাগিয়ে তীর ছোঁড়ার যন্ত্রে লাগিয়ে ছুঁড়ে মারা হয় জানোয়ারকে লক্ষ্য করে।

গায়ে ফোটার পনেরো মিনিটের মধ্যে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে যায় জানোয়ার। তারপর চার ঘণ্টার জন্যে আর খবর নেই। ওটাকে ট্রাকে তুলে বয়ে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় ভরার জন্যে যথেষ্ট সময়।

যে কার্তুজটা আছে তার পকেটে, এটা একটা বড় গণ্ডার, মোষ কিংবা হাতিকে কাবু করে ফেলতে পারে। ছয় থেকে বারোজন মানুষকে গভীর ঘুমে অচেতন করে দিতে পারে।

কিন্তু লোকগুলোর শরীরে ঢোকাবে কি করে এই ওষুধ? তার কাছে ছোঁড়ার যন্ত্র নেই। থাকলেও অবশ্য লাভ হত না। ওদের দিকে যন্ত্র তাক করতে দেখলেই গুলি করত।

চোখ পড়ল চায়ের পাত্রটার ওপর। আগুনে কি ওষুধের গুণ নষ্ট করবে? জানা নেই। পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাচ্ছে লোকগুলো। এত খায় কি করে আল্লাহই জানে! কয়েক মিনিট পর পরই পেয়ালা ভরছে। পাত্রটাতে যদি কোনমতে গিয়ে ওষুধটা ঢেলে দিয়ে আসতে পারে...

মোড়ামুড়ি শুরু করল। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আগুনের

কাছে। যেন শীত লাগছে, উত্তাপ চায়, এমন ভঙ্গি।

সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকাল লোকগুলো।

হাত তুলে জ্বলন্ত কয়লা দেখাল সে। বোঝাল, উষ্ণতা দরকার।

সন্দেহ করল না লোকগুলো। এত ঠাণ্ডার মধ্যে আগুনের আরাম সবাই চায়। আর নজর দিল না তার দিকে।

গড়াতে গড়াতে এমন একটা জায়গায় চলে এল সে, লোকগুলো রইল তার একপাশে, আরেক পাশে আগুন। লোকগুলো আলাপে মগ্ন হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল সে। সাবধানে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওদের অলক্ষ্যে বের করল কার্তুজটা। শরীরের আড়ালে রেখে প্লাগটা খুলে চায়ের পাত্রে ঢেলে দিল ভেতরের ওষুধটা। খালি কার্তুজটা পকেটে ভরে রাখল। ওষুধ কাজ করলেই হয় এখন।

ঘুমের মধ্যেই যেন সরছে, এমন করে চলে এল আবার সুজা আর আউরোর কাছে।

সুজা বুঝে ফেলেছে কি করে এসেছে তার ভাই।

আউরো আন্দাজ করেছে কিছু একটা করা হয়েছে, কিন্তু কী, বুঝতে পারেনি। চুপ করে রইল। নড়লও না কেউ। প্রহরীদের সন্দেহ জাগে এমন কিছু করল না।

উঠে গিয়ে আবার পাত্র থেকে চা ভরে এনে খেতে লাগল লোকগুলো।

উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে রেজা। কাজ হবে তো?

এটাই ওদের শেষ ভরসা। গরমে ওষুধ নষ্ট হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই।

আচ্ছা, ওষুধের গন্ধ পেয়ে যাবে না তো? আশা করল, পাবে না, পুদিনার তীব্র গন্ধ ঢেকে দেবে ওষুধের গন্ধ।

চা খাচ্ছে লোকগুলো।

রেজার মনে হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে খেয়েই চলেছে ওরা। তবু কিছু ঘটছে না। অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে যেন।

কিন্তু আসলে পেরোল পনেরো মিনিট। কথা কেমন জড়িয়ে এল ওদের। তারপর থেমে গেল। ঢুলতে শুরু করল প্রহরীরা।

আনন্দে দুলে উঠল রেজার মন। হচ্ছে, কাজ হচ্ছে!

একজন আরেকজনকে জেগে থাকার জন্যে হুঁশিয়ার করতে লাগল ওরা। কিন্তু গিলেছে তো সবাই। কে জেগে থাকবে? ওষুধ কাবু করে ফেলল ওদেরকে। কয়েক মিনিটেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল তখন তিনজনে।

নড়ছে না প্রহরীরা।

সাবধানে ওদেরকে ডিঙিয়ে এল রেজা। পর্দা সরাল কয়েক ইঞ্চি। উঁকি দিয়ে দেখল বড় গুহাটায় কেউ আছে কিনা।

প্রায় অন্ধকার গুহা। অল্প কয়েকটা মশাল জ্বলছে এখনও। এই সামান্য আলোয় এতবড় গুহার কিছুই আলোকিত করতে পারেনি।

প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না তার। আরও ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল কয়েকজন লোক ঘুমিয়ে আছে। চিতার মাথাকে বালিশ বানিয়েছে।

ফিসফিস করে বলল রেজা, 'কঠিন ঠাঁই। কেউ জেগে উঠলেই এখন মরেছি।'

'অন্ধকার তো,' সুজা বলল। 'দেখতে পাবে?'

'স্পষ্ট না দেখলেও আমাদের পোশাকই বুঝিয়ে দেবে ওদের দলের লোক নই। হলে আলখেল্লা থাকত।'

ঘুমন্ত প্রহরীদের দিকে তাকাল সুজা। 'তাহলে আলখেল্লাই পরে নেব।'

লোকগুলোর ভারি শরীর থেকে আলখেল্লা খোলাটা অত সহজ হলো না, তবে খোলা গেল শেষ পর্যন্ত। দ্রুত সেগুলো পরে নিল ছেলেরা। চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে কেউ এখন বুঝতে পারবে না ওরা কারা।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বড় গুহাটা ধরে এগোল তিনজনে। বুক কাঁপছে। দৌড় দিতে ইচ্ছে করছে। ধরা পড়ার ভয়ে দিল না।

প্রথম লোকটার পাশ কাটাল নিরাপদে।

মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে আরেক দিকে। তবে প্রয়োজন ছিল না—পরনে আলখেল্লা, মুখ তো দেখাই যায় না।

দ্বিতীয় লোকটার কাছে আসতেই মাথা তুলল সে। তিনটে সাদা আলখেল্লা পরা মূর্তি নজরে পড়ল। আবার মাথা নামিয়ে

চোখ মুদল সে।

ধীরেসুস্থে তৃতীয় এবং চতুর্থ লোকটার পাশ কাটাল ওরা।

গুহার বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অলস ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। যেন ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল বলে বাইরের খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে এসেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কেউ পাহারায় আছে কিনা।

কাউকে চোখে পড়ল না।

একদিকে হাঁটা দিল। তবুও যখন কেউ ডাক দিল না, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। আলখেল্লার ঝুল তুলে দিল দৌড়।

আগে আগে ছুটছে রেজা। বাতাস গায়ে লাগতে মোড় ঘুরল। মনে আছে, বাতাসের বিপরীতে যেতে হবে। দিনের মত এত জোরাল না বাতাস। তবু বোঝা যায়।

দুর্গম পথ। চাঁদ আছে আকাশে। কিন্তু থাকলেই কি, কুয়াশার জন্যে ঠিকমত চোখে পঁড়ে না। এর ওপর নির্ভর করে চলা মুশকিল।

তবু থামল না ওরা। ছুটছে। কাঁটায় লেগে হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে গেল, চোখা পাথরে পা কাটল, কিন্তু ছোটার বিরাম নেই।

চোখে পড়ল হোয়াইট লেক। সামনে, মৃদু চিকচিক করছে ঘোলাটে চাঁদের আলোয়।

'ওই যে হাতিটা!' বলে উঠল সুজা।

আশ্চর্য! দিনের বেলা যেখানে দেখেছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'কিন্তু আমি তো দেখছি দুটো,' রেজা বলল। যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে ফেলেছে দৃষ্টি। 'মনে হচ্ছে আরেকটা কালো হাতিও আছে। নাকি সাদাটারই ছায়া?'

গুড়ি মেরে মেরে কাছে এগোতে লাগল ওরা।

মুহূর্তের জন্যে সরে গেল কুয়াশা। পরিষ্কার হলো ধোঁয়াটে চাঁদের আলো। না, আসলেই আছে আরেকটা হাতি। মদ্দা। স্পষ্ট দেখা গেল এখন। ওর কালো চামড়া এই আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

নিচে নামবে কি করে ভাবল রেজা। পথ একটাই, শ্যাওলার ভেতরের সুড়ঙ্গ। খুঁজে বের করা কঠিন হলো।

'আবার ওটায় ঢুকব?' ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না সুজার। 'এই মাঝরাতে!'

'ওটার মধ্যে দিনই কি আর রাতই কি? একই তো অন্ধকার।'

'কিন্তু রাতের বেলা যদি চিতাবাঘ ঢুকে বসে থাকে?'

'থাকলে কিছু করার নেই। আর কোন উপায় নেই আমাদের। অসুবিধে একটাই হবে, হাতে-পায়ে পেঁচাবে এই আলখেল্লা।'

'খুলে ফেলব?'

খুলে রেখে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা। শেষে নিচের ঝুল তুলে কোণগুলো শক্ত করে কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধল ওরা। ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

ভেতরে ছোট ছোট হাজারো শব্দের কোলাহল। অদ্ভুত সব শব্দ। কারা করছে, মোটামুটি জানা আছে ওদের। কিন্তু ছোট ছোট প্রাণীগুলোকে পরোয়া করল না। করার দরকারও নেই। কারণ ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর হিংস্রতম যেটা, সেটা সিভেট ক্যাট। একধরনের বনবিড়াল। ওদের সাড়া পেয়ে ভয়ে ছুটে পালাল।

ঢোকার সময় যে অসুবিধে হয়েছিল সুজার, এখন পথ জানা থাকায় সেটা আর হলো না। বাইরে বেরিয়ে এল নিরাপদে।

নামতে নামতে ব্ল্যাক লেক আর গ্রীন লেকের পাশ কাটাল, তারপর গরিলাদের বাঁশবনের ভেতর দিয়ে এসে পৌঁছল ক্যাম্পে।

এতটাই ক্লান্ত, কথা বলার শক্তিও আর নেই। সোজা বিছানায় পড়তে ইচ্ছে করছে, পড়েই ঘুম।

'কিন্তু এখুনি একটা কাজ না সারলে হবে না,' রেজা বলল। 'ডাকাতদের আস্তানা কোথায় জেনে গেছি। পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

আউরোর বাবাকে জাগানো হলো।

রাতদুপুরে ছেলেকে দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইল না। শেষে নেচে উঠল আনন্দে। তক্ষুণি একজন লোক পাঠাল

পর্বতের পাদদেশে মুটুয়াঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে।

এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলায় মহা বিরক্ত হলো পুলিশেরা। সকালের আগে বেরোতে পারবে না, সাফ বলে দিল।

কি আর করা? অপেক্ষা করতেই হলো।

তবে সকালে ওগারোর গাঁয়ে এল ওরা। পথ দেখিয়ে ডাকাতদের গুহায় তাদের নিয়ে চলল রেজা। সঙ্গে নিয়েছে তার দলবল।

গুহার কাছে পৌছল দুপুরের সামান্য আগে। কিন্তু গুহায় ঢুকে দেখা গেল খালি গুহা। কোন মানুষ নেই।

বন্দিরা পালিয়েছে জেনেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয় ডাকাতেরা। পালিয়েছে। জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। বাতাসে ভাসছে কেবল পুদিনার গন্ধ।

'ভীষণ শয়তান ব্যাটারা!' নাকমুখ কুঁচকে বলল রেজা।

সাংঘাতিক দুর্গম পথ পার হয়ে আসতে পুলিশেরও কষ্ট হয়েছে। শীতে কাবু হয়ে গেছে ওরা। হাত-পায়ের নানা জায়গায় জখম। রাগটা পড়ল রেজাদের ওপর। কিন্তু যেহেতু ডাকাতরা গুহায় থাকার প্রমাণ আছে, দোষ দিয়ে কিছু বলতে পারল না। কেবল কালো মুখগুলোকে আরও কালো করে রাখল।

চোদ্দ

এরপর কি করবে বুঝতে পারছে রেজা। সাদা হাতিটা দেখেছে ডাকাতেরা। এই এলাকা ছাড়ার আগে ওটা ধরার চেষ্টা করবে বজ্রমানব।

'সময় কম,' বলল সে। 'ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছে কিনা কে জানে! তবে বোধহয় পারেনি। কারণ সকালটা গেছে জিনিস গোছগাছ করতে। সুযোগ একটা পেলেও পেতে পারি।'

হোয়াইট লেকের দিকে ফিরে চলল ওরা।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছে সুজা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রেজা। 'ভাবছিস মনে হয় কিছু?'

মুখ তুলে তাকাল সুজা। 'হ্যাঁ, ভাবছি। একটা চালাকি করলে কেমন হয়?'

'কি চালাকি?'

বুদ্ধিটা খুলে বলল সুজা।

হাসল রেজা। 'এতে কাজ হলেও হতে পারে। এখান থেকে

ক্যাম্পে যাওয়ার নিশ্চয় অন্য কোন পথ আছে, শর্ট কাট। নইলে গাঁ থেকে হাতি ধরে আনতে পারত না ডাকাতেরা। একজন পুলিশকে সাথে নিয়ে যা তুই, রাস্তাটা খুঁজে বের কর। আমি অন্যদের নিয়ে ঘুরপথে যাই।'

'বেশ। এক ঘণ্টার মধ্যে খুদে দানবকে নিয়ে হোয়াইট লেকে পৌঁছে যাব।'

শর্ট কাট রাস্তাটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। সেটা ধরে একজন পুলিশের সঙ্গে ক্যাম্পে এসে পৌঁছল সুজা।

সাপ্লাই ট্রাক খুঁজে একটা স্প্রে গান বের করল। সাদা রঙ ভরল সেটাতে। অবাক হয়ে তার কাজ দেখছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু ওদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে কোন কথা বলল না সে।

ডাক দিল খুদে দানবকে।

আনন্দে শুঁড় তুলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল হাতির বাচ্চা।

'তোর জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি, খুদে। আয় আমার সঙ্গে।'

পুলিশ সঙ্গীকে নিয়ে আবার হোয়াইট লেকে ছুটল সুজা। বাচ্চাটা চলল পেছন পেছন।

পাহাড় বেয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়, তার ওপর তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে, হাঁপিয়ে পড়ল দু-জনে। লিটল মনস্টারের অবশ্য অতটা অসুবিধে হলো না। পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস আছে তার।

হ্রদের তীরে পৌঁছে দেখল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে রেজারা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে পুলিশ। বার বার চলে যেতে চাইছে। ওদেরকে বোঝাতে বোঝাতে অস্থির হয়ে গেছে রেজা।

হাতে স্প্রে গান আর সঙ্গে একটা বাচ্চা হাতিকে নিয়ে সুজাকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ওদের। হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল।

তাদের প্রশ্নের জবাব দিল না সুজা। কুয়াশার মধ্যে সাদা হাতিটাকে খুঁজছে তার চোখ।

'দেরি করে ফেললাম নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করল সে। 'ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেল না তো?'

'এখনও নেয়নি,' রেজা বলল। 'তবে খারাপ খবর আছে। একজন লোক পাঠিয়েছিলাম খবর নিতে। গোপনে দেখে এসেছে ডাকাতেরা অনেক লোক, যা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের ডবল। এদিকেই আসছে। সবার কাছে পিস্তল আছে। সেই তুলনায় আমাদের কাছে তেমন কোন অস্ত্র নেই। পুলিশের আছে বল্লম, কুলিদের কাছে ছুরি।'

আগ্নেয়াস্ত্র না থাকারই কথা, শিকার করতে আসেনি ওরা। যদি কোন কারণে বিপদে পড়ে যায়, সে-জন্যে সতর্কতা হিসেবে একটা রাইফেল এনেছে, মুংগার হাতে আছে সেটা।

'একসাথে দল বেঁধে এসে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর,' রেজা বলছে, 'ওদের সঙ্গে পারব না আমরা। তবে

তোর রঙের বুদ্ধিটা কাজে লাগলে বোকা বনতেও পারে, তাতে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। এক এক করে কাবু করব তখন।'

'তা তো হলো। কিন্তু আমাদের শ্বেতহস্তী কোথায়?'

'ওদিকে। ওই পাথরগুলোর কাছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুয়াশার মধ্যে খুঁজতে লাগল সুজা। প্রথমে সাদা-কালো কিছু পাথর চোখে পড়ল। তারপর নড়ে উঠল সাদা একটা পাথর। তার পর পরই জায়গা বদল করল কালো একটা পাথর, শুঁড় তুলে চিৎকার করে উঠল।

পা টিপে টিপে কালো হাতিটার কাছে চলে এল রেজা আর সুজা।

ওদের দেখেই সরে যেতে লাগল হাতিটা।

দৌড়ে ওটার কাছে চলে এল দু-জনে। স্প্রে গান তুলে সাদা রঙ ছিটাতে শুরু করল ওটার শরীরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো হাতিটা পরিণত হলো সাদা হাতিতে। পুরো শরীর রঙ করার দরকার পড়েনি। কুয়াশার মধ্যে বোঝারই উপায় রইল না ওটা কালো হাতি।

মানুষের অদ্ভুত আচরণে ভড়কে গেছে হাতিটা। চিৎকার করছে সমানে।

'করুক,' রেজা বলল। 'যত চেঁচাবে, তত তাড়াতাড়ি এটাকে খুঁজে পাবে ডাকাতেরা।'

শোনা গেল ডাকাতদের হই-চই। ছুটে আসছে ওরা।

দ্রুত নির্দেশ দিল রেজা। দশ-পনেরোজন কুলিকে পাঠাল

রঙ করা হাতিটার পেছনে। বাকিরা সাদা হাতিটার কাছাকাছি হ্রদের তীরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল রেজা—হে কুয়াশা, আরও, আরও বেশি করে পড়ো! ঘন হয়ে পড়ো! যাতে ডাকাতেরা হাতিটাকে চিনতে না পারে!

যেন তার প্রার্থনা সত্যি শুনতে পেল চন্দ্রপাহাড়। সাহায্য করল ওদেরকে। হঠাৎ করে সাংঘাতিক ঘন হয়ে গেল কুয়াশা। দশ হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না।

কুয়াশার মধ্যে শোনা গেল চিৎকার, আরবিতে চেঁচিয়ে কথা বলছে ডাকাতেরা। কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারছে রেজা। রঙ করা হাতিটাকে তাড়া করেছে ওরা।

পরিকল্পনার একটা অংশ তো ঠিকঠাক মতই হচ্ছে। বাকিটা হবে তো? সাদা হাতিটা এখন ডাক ছাড়লেই হয়। রেজা দেখেছে, এটা মাদী হাতি। কালোটা পুরুষ। ওটা বিপদে পড়েছে বুঝে ডাকাডাকি করবে তো? করলে কয়েকজন ডাকাত দেখতে আসতে পারে। তখন হামলা চালিয়ে কাবু করে ফেলা যাবে ওদের।

কিন্তু সাদা হাতিটা অতিমাত্রায় ভদ্র। চুপচাপ রইল। এত শোরগোলেও যেন ওটার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে পারল না। তারমানে কি ব্যর্থ হতে যাচ্ছে সুজার পরিকল্পনা?

আর বসে থাকা যায় না। মরিয়া হয়ে রেজাই হাতির ডাক ডাকতে আরম্ভ করল। চিৎকারের পর চিৎকার।

সাড়া দিল ডাকাতেরা। হট্টগোল আর ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে এল একজন ডাকাত।

মুহূর্তে তাকে কব্জা করে ফেলল পুলিশ। পিস্তল ব্যবহারের সুযোগই পেল না লোকটা, কেড়ে নেয়া হলো। ধরেই হাত-পা বাঁধা শেষ।

কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আরেক ডাকাত। তাকেও আটকে ফেলা হলো।

তারপর বেরোল তিনজন একসঙ্গে। দু-জনকে কাবু করে ফেলা গেল কোন গোলমাল ছাড়া, কিন্তু তৃতীয়জন পিস্তল তুলে গুলি করে বসল।

পড়ে গেল একজন পুলিশ।

গুলির শব্দ শুনে দল বেঁধে ছুটে এল ডাকাতেরা। দশ-বারোজন একসঙ্গে বেরিয়ে এল কুয়াশার আড়াল থেকে। প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই বেধে গেল পুলিশ আর কুলিদের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত পারল না ডাকাতেরা। আটক হলো। হাতে গুলি খেল রেজার সবচেয়ে ভাল যোদ্ধাদের একজন, হামবি। কিন্তু তার পরেও লড়াই বন্ধ করল না।

ওষুধ লাগিয়ে তার জখম বেঁধে দিতে চাইল রেজা।

'ওসব পরে,' বলে এড়িয়ে গেল হামবি।

রঙ করা হাতিটাকে নিয়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে দৌড়ে গেল সুজা। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, ওটাকে ঘিরে ফেলেছে ডাকাতেরা। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে

ফেলার চেষ্টা করছে। দুই দিকে হাতির ডাক শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে কয়েকজন ডাকাত। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনদিকে যাবে। যারা হাতির বেশি কাছে রয়েছে, তারা বুঝে ফেলেছে এটা রঙ করা হাতি, বিমূঢ় হয়ে গেছে এরা। ব্যাপারটা কি ঘটেছে মাথায়ই ঢুকছে না তাদের।

হঠাৎ আরেকটা হাতির চিৎকার কানে এল সুজার। এটা রেজার কণ্ঠ থেকে বেরোয়নি।

কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে গেল সে। দেখল, সাদা হাতিটা সরে গিয়েছিল, ওটাকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন ডাকাত। তলোয়ার দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওদের ক্যাম্পের দিকে। রাগে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছে জানোয়ারটা।

ওদের নিষ্ঠুরতা দেখে সুজার মনে হলো এই লোকগুলোই হয়তো গাঁয়ে গিয়ে সেদিন কিশোর হাতিটার শুঁড় কেটেছিল।

কিন্তু সাদা হাতি ভদ্র হলেও সহ্যের একটা সীমা আছে। কত আর কষ্ট সহ্য করবে? আচমকা ঘুরে গিয়ে রুখে দাঁড়াল সে। এ রকম কিছু ঘটতে পারে আশা করেনি বোধহয় লোকগুলো। সরে যাওয়ারও সুযোগ পেল না। চোখের পলকে দু-জনকে দাঁত দিয়ে গেঁথে ফেলল হাতি। পা দিয়ে পিষে ভর্তা করে দিল আরেকজনকে। শুঁড় দিয়ে বাড়ি মেরে শুইয়ে দিতে লাগল নাগালে যাকে পেল।

সাদা হাতিটার চিৎকার শুনে সমস্ত বাধা পায়ে দলে

পড়িমরি করে ছুটে কালো মদ্দা হাতিটা। আক্রমণ করে বসল ডাকাতদের।

দুটো খেপা হাতির আক্রমণ ঠেকানোর সাধ্য হলো না ডাকাতদের। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক দৌড় মারল। গিয়ে পড়ল পুলিশ আর কুলিদের খপ্পরে।

ওরা জিতে গেছে, বুঝতে পারল রেজা। কিন্তু বজ্রমানবের কথা ভুলে গিয়েছিল সে।

কুয়াশা সরে এসে ঢেকে ফেলল রেজাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর সেটা সরতেই দেখল, ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে শেখ।

কুটিল হাসি হাসল ডাকাত সর্দার। 'বাহ্, তুমি এখানে! তোমাকেই খুঁজছিলাম!'

খাপ থেকে পিস্তল খুলল সে।

'দাঁড়ান,' হাত তুলল রেজা, 'আমার কাছে পিস্তল নেই। আমি শুনেছি, আরব যোদ্ধারা মুখোমুখি লড়াইয়ে নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করে না। কাপুরুষতা মনে করে। আপনিও আরব। সাহস থাকলে পিস্তলটা ফেলে দিন। তারপর আসুন। দেখা যাক কে হারে, কে জেতে।'

পিস্তল ফেলল না শেখ, তবে খাপে ঢুকিয়ে রাখল।

'তুমি একজন আরব শেখকে কাপুরুষ বলো! এসো, দেখি, কতটা বাঘের বাচ্চা?'

বিশাল বপু নিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে রেলইঞ্জিনের গতিতে রেজাকে আঘাত করতে ছুটে এল শেখ।

শেষ মুহূর্তে পথ থেকে সরে গেল রেজা। জুডোর কায়দা প্রয়োগ করল শেখের ওপর। লোকটার নিজের ওজন আর শক্তিকে কাজে লাগিয়েই কাবু করার চেষ্টা করল তাকে।

বিফল হলো না। দড়াম করে মুখ নিচু করে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল যেন পাহাড়। মাথা ঠুকে গেল ভীষণ ভাবে। অজ্ঞান হয়ে গেল।

যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে আসতে পারে লোকটার। সঙ্গে দড়ি নেই। তাড়াতাড়ি শেখের লম্বা আলখেল্লা ছিঁড়ে ফালি করে দড়ি পাকিয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল রেজা।

চোখ মেলল শেখ। হাত-পা নড়ানোর চেষ্টা করে পারল না। বুঝতে পারল, আর কিছু করার নেই তার। চুপ হয়ে গেল।

কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পুলিশেরা, সঙ্গে মুংগা। অবাক হয়ে একবার তাকাতে লাগল পড়ে থাকা দানবটার দিকে, একবার রেজার দিকে।

'ওরা বলছে,' মুংগা বলল রেজাকে, 'আপনি সাদা মানুষের জাদু ব্যবহার করেছেন। নইলে এই দৈত্যের সঙ্গে পারতেন না। আপনাকে পিষে ফেলত।'

'জাদু-ই,' মুচকি হাসল রেজা, 'তবে সাদা মানুষের নয়। এশিয়ানদের।'

কুলিদের সহায়তায় বন্দিদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

রেজা-সুজা রয়ে গেল। তাদের অন্য কাজ আছে।

খুদে দানবকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখে একজন

লোককে তার পাহারায় রেখে দিয়েছিল সুজা। এখন দেখল, বড় হাতি দুটোর সঙ্গে গিয়ে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে বাচ্চাটা। তার পরিকল্পনার এটাও একটা অংশ ছিল।

হাতির স্বভাব ভাল করে জানা আছে তার। মা-হারা বাচ্চা হাতিকে দেখাশোনার ভার পড়ে অন্য বয়স্ক মাদী হাতির ওপর। স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিয়ে নেয় হস্তিনী। 'খালা' হয়ে যায় শিশুটার। প্রয়োজন পড়লে তাকে নিজের দুধ খাইয়েও বাঁচিয়ে রাখে।

সুজা দেখল, বাচ্চাটার সঙ্গে শুঁড় জড়াজড়ি করে আদর করছে সাদাটা। গলার ভেতরে বিচিত্র ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে দুটোরই। এ যেন আদর করে চুমু খাওয়ার সঙ্গে সোহাগের কথা।

সুজাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে এল খুদে দানব।

ক্যাম্পে যাওয়ার জন্যে তাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সুজা।

এইবার হবে অগ্নিপরীক্ষা। শিশু হাতির মায়ায় সাদাটা কি আসবে সঙ্গে সঙ্গে? লড়াইয়ের আগে হলে এককথা ছিল, কিন্তু এখন মানুষের ওপর ঘৃণা জন্মেছে হাতিটার, নিষ্ঠুর ভাবে তাকে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়েছে মানুষ। শত্রু আর বন্ধুর পার্থক্য কি বুঝতে পারবে? জোর খাটিয়ে তাকে বন্দি করা যায়নি, মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে কি টেনে আনা যাবে?

বাচ্চাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতিটা।

বাচ্চাটা একশো গজ সরে গেল···দুশো গজ···তবু নড়ছে না সে।

খালা যে আসছে না এতক্ষণে খেয়াল করল খুদে দানব। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল।

হাতির ভাষা না জানলেও আন্দাজ করতে পারল রেজা-সুজা, কি বলছে বাচ্চাটা। আদুরে গলায় বলছে—*প্লীজ, খালা, এসো না আমাদের সঙ্গে! তোমাকে আমার ভাল লেগেছে!*

এই ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই মাদী হাতির। কেঁদে উঠল মায়ের অন্তর। জবাব দিল—*ঠিক আছে, খোকা, আসছি! দাঁড়া!*

এক পা দু-পা করে এগোতে শুরু করল শ্বেতহস্তী। গতি বাড়ছে। এগিয়ে আসতে লাগল হেলেদুলে। একবার দ্বিধা করে কালো হাতিটা পিছু নিল সাদাটার। সে-ও সঙ্গিনীকে হারাতে রাজি নয়।

তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্যে আনন্দে চিৎকার করে ছুটে গেল বাচ্চাটা। দুটোর মাঝখানে থেকে গায়ে গা ঠেকিয়ে জড়াজড়ি করে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। যেন বাবা-মাকে পেয়ে গেছে। এগোল রেজাদের ক্যাম্পের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে প্রাণী জগতের এক অপার বিস্ময় দেখছে দুই ভাই। চোখে জল এসে গেল ওদের। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওরাও এগোল হাতিগুলোর পেছন পেছন।

*****